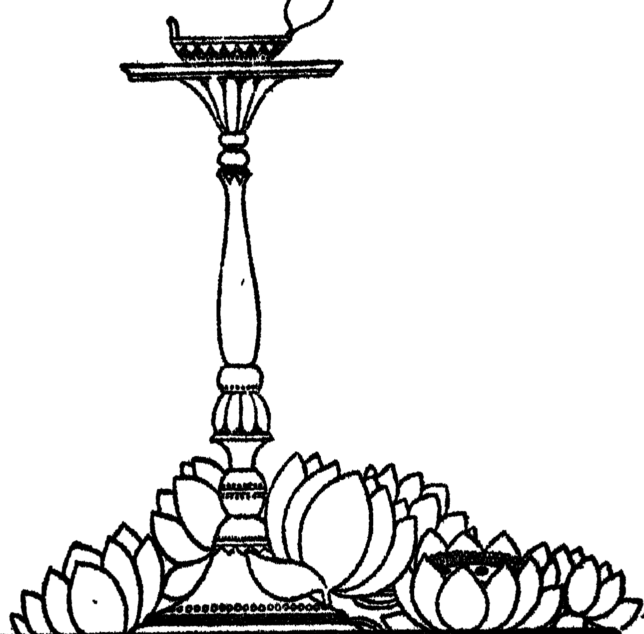
মণি-দীপা

শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়



ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস

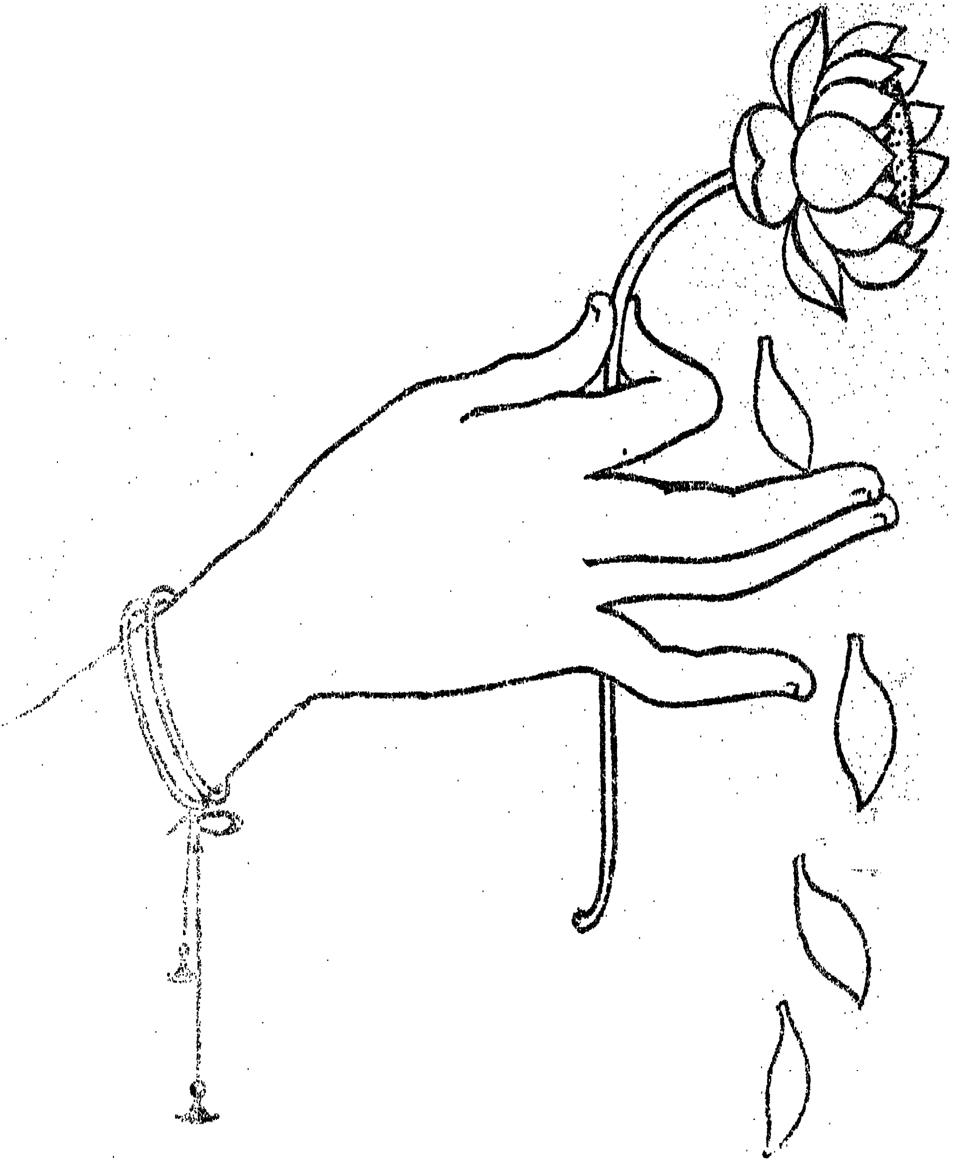
প্রকাশক
শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ মল্লিক
ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস,
কলিকাতা

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক
ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড্
কলিকাতা হইতে
মুদ্রিত

কবি-গুরু

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীচরণেষু



ভূমিকা

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রলাল রায় কবি হিসেবে এবং গল্প-লেখক হিসেবে বাংলার সাহিত্য-সমাজে সুপরিচিত। সুতরাং আমার পক্ষে আবার নূতন ক'রে বাঙালী পাঠকদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। তবে লেখক নতুন লেখক না হ'লেও তাঁর এই পদ্য-সংগ্রহের বিষয় নতুন। এ কবিতা-গুলি তিনি নিজের মাথা থেকে বা'র করেন নি—সবগুলিই অপর কবিদের রচনার অনুবাদ মাত্র।

যাঁরা লেখক নন্ শুধু পাঠক মাত্র, তাঁদের অনেকের হয় ত বিশ্বাস যে, নিজে লেখার চাইতে অপরের লেখা অনুবাদ করা ঢের সহজ; কারণ ভাব ত পরের কাছ থেকেই পাওয়া যায়। অতএব অনুবাদ করার ভিতর যা কিছু মুস্কিল আছে সে হচ্ছে শুধু এক ভাষার কথা অপর ভাষায় রূপান্তরিত করায়। কিন্তু একটি কথা ভেবে দেখ্‌লেই তাঁরা বুঝ্‌তে পার্‌বেন যে, নিজে লেখার চাইতে অনুবাদ করা কিছু মাত্র কম কঠিন নয়। আমরা যখন নিজ ভাষাতে রচনা করি তখন আমাদের মনোভাব আপ্‌না হ'তেই তার ভাষা-দেহ গ'ড়ে নেয়। কিন্তু অনুবাদে অপরের কাছ থেকে ভাষা বাদ দিয়ে শুধু ভাবটুকু নিয়ে তাকে স্ব-ভাষায় দেহ দিতে হয়। এক ভাষা থেকে কবিতা আর এক ভাষায় রূপান্তরিত কর্‌তে গেলে তার মানে কতকটা রক্ষা কর্‌তে পার্‌লেও তার রূপ প্রায়ই রক্ষা করা যায় না। আর কবিতার যদি রূপই না থাক্‌ল, তা হ'লে তার আর থাক্‌ল কি? সেই অনুবাদই যথার্থ অনুবাদ যার অঙ্গে নতুন স্বদেশী রূপ ফু'টে ওঠে—এক কথায় যা পড়্‌তে মনে হয় তা মূল কবিতা। সুতরাং এ যে কি কঠিন কাজ তা সকলেই অনুমান কর্‌তে পারেন।

অপর ভাষার কবিতা তিনিই বাঙ্‌লা কবিতায় পরিণত কর্‌তে পারেন স্ব-ভাষা যাঁর যথেষ্ট করায়াত্ত। বাঙ্‌লা ভাষা যে হেমেন্দ্র বাবুর হাতে যুগপৎ রূপ ও আকার লাভ করে এ সত্য তাঁর কাছেই সুবিদিত যিনি বর্ত্তমান বাঙ্‌লা

সাহিত্যের সঙ্গে সুপরিচিত। সুতরাং তাঁর অনুদিত অনেক কবিতাই যে খাঁটি বাঙ্‌লা ব'লে চ'লে যেতে পারে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

অনুবাদও হচ্ছে এক রকম হরণ। আর কাব্য-জগতে হরণ ও আহরণ দুই-ই সমান বৈধ—এই হচ্ছে আলঙ্কারিকদের মত, অবশ্য হরণ কর্‌বার কৌশল যদি কবির করায়ত্ত হয়, অর্থাৎ কবি যদি পরের মনোভাবকে নিজের অন্তরে বাগিয়ে নিয়ে তাকে একটা নিজস্ব রূপ দিতে পারেন,—এক কথায় তাকে সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করতে পারেন। অনুবাদের কৃতিত্বই এইখানে এবং এ গ্রন্থের বহু কবিতায় হেমেন্দ্র বাবু সে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

তিনি ভারতবর্ষের নানা দেশের, নানা কালের, নানা ভাষার কবিতা বাঙ্‌লা ক'রে বাঙালী পাঠককে উপহার দিয়েছেন। আর এ গ্রন্থের হিন্দী, গুজরাটী, মাদ্রাজী প্রভৃতি কবিতাগুলি এতটা বেমালুম বাঙ্‌লা হ'য়ে গেছে যে, কোনও বাঙালীর কান ও মন তাদের বিজাতীয় ব'লে প্রত্যাখ্যান কর্‌বে না। হেমেন্দ্র বাবুর অনুবাদ প'ড়ে মনে হয় যে, আমরা বাঙালীই হই, গুজরাটীই হই, আর মাদ্রাজীই হই, আমাদের পরস্পরের মনের স্পষ্ট কুটুম্বিতা আছে। আর বিশেষ বিশেষ অবস্থায় আমাদের সকলেরই অন্তরের ভাষা এক, যদিও আমাদের মুখের ভাষা পৃথক।

হেমেন্দ্র বাবু ভারতবর্ষের নানা দেশের ভাষা থেকে সুভাষিতাবলী অনুবাদ ক'রেই ক্ষান্ত হ'ন নি, তিনি বৈদিক মন্ত্র ও সংস্কৃত কাব্যের নানা অংশেরও বাঙ্‌লা করেছেন। এক হিসেবে বাঙ্‌লা সংস্কৃতের অতি নিকট আত্মীয়, আর এক হিসেবে অর্থাৎ ধ্বনির হিসেবে এ উভয়ের সম্পর্ক অতি দূর। বেদ বড় জোর বাঙ্‌লা গদ্যে অনুবাদ করা যায়, কিন্তু ও দেব-ভাষা কিছুতেই বাঙ্‌লা পদ্যের ভিতর ধরা দেয় না। গায়ত্রী মন্ত্রকে বাঙ্‌লা ভাষায় রূপান্তরিত কর্‌লে ও মন্ত্র আমাদের কান ও মন দু'য়ের একটিকেও স্পর্শ কর্‌বে না। এজন্য দোষী অনুবাদক নয়, দোষী আমাদের স্বল্প-প্রাণ ভাষা। ভাষা ও ভাব যে একই পদার্থ, অর্থাৎ ভাষা বাদ দিয়ে যে ভাব নেই, আর ভাব বাদ দিয়ে যে ভাষা নেই—এ সত্যটি যাঁর কাছে সংস্কৃত শাস্ত্র ও কাব্য পরিচিত তাঁর কাছেই স্পষ্ট। সুতরাং হেমেন্দ্র বাবু বেদের যে সকল অংশ অনুবাদ করেছেন তা থেকে আমরা সে কালের ঋষিদের মনের একটা আভাস পাই মাত্র, তার ধ্বন্যাত্মক রূপ আমাদের চোখের সুমুখে ফু'টে ওঠে না। মন্ত্র-বক্তা ঋষিরা যে মন্ত্র-দ্রষ্টাও ছিলেন, সে সত্য কোনও অ-বৈদিক ভাষার মারফৎ আমাদের পক্ষে প্রত্যক্ষ করা অসম্ভব।

আমি বৈদিক ভাষা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। অথচ কোনো বেদ-মন্ত্র আমার কানে আস্‌বা মাত্র আমার মনকে তা আনন্দে পরিপ্লুত ক'রে তোলে। এর কারণ ওর, প্রতি ধ্বনিটি আমার মগ্ন চৈতন্যে অস্পষ্ট ভাবের ঝঙ্কার তোলে। আমার কাছে ও ভাষার প্রতি ধ্বনিটি অর্থ-গর্ভ। এমন কি আমার বিশ্বাস যে, বৈদিক ভাষা ব্যতীত পৃথিবীর অন্য কোনো ভাষাই মন্ত্র-দেহ হ'তে পারে না।

অর্ব্বাচীন সংস্কৃত ভাষার অন্তরে অবশ্য মন্ত্র-শক্তি নেই। কিন্তু সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যের সর্ব্ব প্রধান গৌরবই তার ধ্বনি-গৌরব। ধ্বনির ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য ও ভাষার অতুলনীয়। বিশেষতঃ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সংস্কৃত কবি কালিদাসের অনেক কবিতার সৌন্দর্য্য তার ধ্বনির কি বাণীর উপর নির্ভর করে তা বলা অসম্ভব। উদাহরণ স্বরূপ মেঘদূতের উল্লেখ করা যেতে পারে। সুতরাং যাঁর ছন্দের কান আছে এবং যাঁর হাতে বাঙ্‌লা ভাষা ছন্দ-দেহ ধারণ করে, তিনি মেঘদূত বাঙ্‌লায় অনুবাদ কর্‌তে ব্রতী হ'লেই 'মন্দাক্রান্তা'য় অনুবাদ কর্‌বার লোভ হওয়া তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। এই জন্যেই বাঙ্‌লার একাধিক নতুন কবি মেঘদূত 'মন্দাক্রান্তা' ছন্দে অনুবাদ কর্‌তে প্রয়াস পেয়েছেন। হেমেন্দ্র বাবুও মেঘদূতের গুটিকত শ্লোক 'মন্দাক্রান্তা' ছন্দে আবদ্ধ করে বাঙ্‌লা-পাঠকদের উপহার দিয়েছেন। এ বিষয়ে তিনি যে অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তা অস্বীকার কর্‌বার উপায় নেই। তবে এ সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ কর্‌বার পুর্ব্বে একথা মনে রাখা দরকার যে, তাজমহল ইটে তর্‌জমা করা একরকম অসাধ্য সাধন করা। বাঙ্‌লা ভাষায় 'মন্দাক্রান্তা'র সুর ও তাল দুই সমান রক্ষা করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। ও ছন্দের তাল রক্ষা কর্‌তে গিয়ে সুর আল্‌গা হ'য়ে পড়ে। এর মূল কারণ— বাঙ্‌লা ভাষার এক-তারাতে সংস্কৃত রুদ্র বীণার ঝঙ্কার তোলা যায় না।

সে যাই হোক্‌, এই অনুদিত কাব্য-গ্রন্থ প'ড়ে বাঙালী পাঠক যে আনন্দ লাভ কর্‌বেন তাতে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নেই, আর তাঁরা আনন্দ লাভ কর্‌লেই হেমেন্দ্র বাবুর পরিশ্রম সার্থক হ'বে।

২০, মে-ফেয়ার,
বালীগঞ্জ

শ্রী-প্রমথ চৌধুরী



নিবেদন



কবিদের মনের খনিতে যে মণি জন্মায় তাহাই দিয়া গড়িয়া উঠে বাণীর মন্দিরে মণির প্রদীপ। ভারতের যিনি ভারতী তাঁহার মন্দির-তলেও মণি-দীপের অভাব নাই। এই সব প্রদীপের কয়েকটির দীপ্তি হইতে দীপ্তি ধার করিয়াই রচিত হইল 'মণি-দীপা'র অঙ্গরাগ। নামের কৈফিয়ৎটা হয়তো খুব সুস্পষ্ট হইল না। তাই সাদা কথায় বলা দরকার—ভারতবর্ষের নানা ভাষায় যে সব 'লিরিক' আছে 'মণি-দীপা' তাহারই কতকগুলির অনুবাদ।

এই অনুবাদ-গ্রন্থে প্রথমেই আমি সংস্কৃতকে স্থান দিয়াছি। 'লিরিক' বলিতে যাহা বুঝায় তাহা সংস্কৃত সাহিত্যে খুব বেশী নাই। বস্তুতঃ 'মেঘদূত' এবং 'গীত-গোবিন্দে'র মত দুই চারি খানি গ্রন্থকে বাদ দিলে প্রকৃত 'লিরিক'-এর রূপ সংস্কৃত-কাব্যে বিশেষ চোখে পড়ে না। অমরু, ভর্ত্তৃহরি, হাল-সাতবাহন প্রভৃতির কবিতায় 'লিরিক'-এর ধাঁচ্ আছে, কিন্তু ব্যাপকতা নাই। চার লাইনের একটি করিয়া শ্লোকে তাঁহাদের কবিতা শেষ হইয়াছে। এই সমস্ত শ্লোকের ভিতর বাক্-চাতুর্য্য বা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় যতখানি আছে, যে গভীর চিত্তাবেগ 'লিরিক'-এর প্রাণ তাহার পরিচয় ততখানি নাই। এই জন্যই বেশীর ভাগ স্থানে তাহাদের ভিতর রসানুভূতির দৈন্য এবং কৃত্রিমতার প্রাচুর্য্য সুপরিস্ফুট। অবশ্য এ কথা একান্ত সাধারণ ভাবেই বলা চলে, সমস্ত শ্লোকের সম্বন্ধে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে বলা চলে না—কারণ কোনো কোনো শ্লোকের চারিটি মাত্র লাইনে এমন প্রগাঢ় রসানুভূতির ছাপই আবার আছে যে, অন্য খুব কম ভাষার কবিতাতেই তাহার তুলনা পাওয়া যায়। 'মণি-দীপা'য় এই দুই রকমের কবিতার নমুনাই সংগৃহীত হইয়াছে, অর্থাৎ যে সকল শ্লোকের বৈচিত্র্য কেবল ছন্দে এবং শব্দ-চয়নের নিপুণতায় তাহাও স্থান পাইয়াছে, আবার গভীর চিত্তাবেগের দ্বারা প্রকৃত 'লিরিক'-এর রহস্যের মর্ম্ম-কেন্দ্র যে সব শ্লোক উদ্ঘাটিত করিয়াছে তাহাও স্থান পাইয়াছে। উদাহরণ উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন। কারণ রসবেত্তা পাঠক তাহা নিজেই বাছিয়া লইতে পারিবেন।

এই প্রসঙ্গে অমরুর নামটি বিশেষ করিয়া উল্লেখ করা দরকার মনে করি। চার লাইনে সম্পূর্ণ বহু শ্লোক প্রায় সমস্ত সংস্কৃত কবিই রচনা করিয়াছেন, এমন কি কালিদাসও বাদ যান নাই। কিন্তু সব দিক দিয়াই এই বিভাগটিতে অমরু অতুলনীয়। কালিদাস প্রভৃতিতে প্রকাশ-ভঙ্গির মুন্সিয়ানা আছে, ছন্দে নৃত্যের অপরূপ ঝঙ্কার আছে, কিন্তু মোটের উপর তাহা স্থূল ইন্দ্রিয়ানুভূতির ব্যাপার। দেহের সীমা ছাড়াইয়া যে অনুভূতি একটা অতীন্দ্রিয় রাজ্যের মাঝখানে হৃদয়কে টানিয়া লইয়া যায় তাঁহাদের এই সব শ্লোকে তাহার ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। স্থূল দৈহিক কামনার উপর লোভ অমরুরও আছে, কিন্তু মনোবৃত্তির অদ্ভুত বিশ্লেষণ এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রগাঢ় রসানুভূতির পরিচয়ও তাঁহার ভিতর দুর্লভ নহে।

কেবল এই সব ছুট্‌কা ও বিচ্ছিন্ন শ্লোক নহে, 'মণি-দীপা'য় এরূপ অনেক শ্লোকও স্থান পাইয়াছে যাহা কোনো নাটক বা মহাকাব্যের ভিতর হইতে বাছিয়া লওয়া হইয়াছে। এই ভাবে কাব্য ও নাটকগুলির অঙ্গ-হানি করার কৈফিয়ৎ আমার এই যে, এই সব শ্লোকে 'লিরিক'-এর ভাগ এত বেশী সুস্পষ্ট যে, তাহাদিগকে আলাদা করিয়া লইলেও তাহাদের পরিপূর্ণ রূপের কোনো ব্যাঘাত হয় না। শ্রীহর্ষের 'নাগানন্দ' এবং 'রত্নাবলী', কালিদাসের 'শকুন্তলা' 'মেঘদূত' এবং 'কুমার-সম্ভব', ভবভূতির 'উত্তর চরিত', রাজশেখরের 'বিদ্ধ-শাল-ভঞ্জিকা' প্রভৃতি গ্রন্থ, এই ভাবে খণ্ডিত হইয়া তাহাদের কতকগুলি শ্লোক আমাকে উপহার দিয়াছে। উপনিষদ, বেদ ও কালিকা-পুরাণ হইতে আমি যে শ্লোকগুলি লইয়াছি তাহাও এই ধরণের। তাহা ছাড়া কতকগুলি শ্লোক লইয়াছি 'উদ্ভট'-সংগ্রহ হইতে। এই শ্লোকগুলির দুই একটি বিখ্যাত কবিদের নামের সঙ্গেও সংযুক্ত। কিন্তু নিশ্চিত কোনো প্রমাণ পাই নাই বলিয়া তাহাদিগকে 'উদ্ভটে'র ভিতরেই স্থান দিতে হইয়াছে।

সংস্কৃতের সম্পদ এবং ব্যাপকতা সম্বন্ধে বাঙ্গালী সাহিত্য-রসিকদের সকলেরই অল্প-বিস্তর ধারণা আছে, কিন্তু সংস্কৃত ছাড়াও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের কাব্য-সাহিত্যের সমৃদ্ধিও যে সামান্য নহে—আমাদের রসজ্ঞেরা তাহার খবর অল্পই রাখেন। এই অনুবাদ-গ্রন্থের ভার হাতে লইবার আগে সে খবর আমারও জানা ছিল না। প্রাচীন হিন্দী, তামিল প্রভৃতি সাহিত্যের কাব্য-রাজ্যের বিশালতা দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি। এ রাজ্যগুলি যেন রূপ-কথার মায়াপুরীর মতো। রূপ ইহাদের অসাধারণ, সম্পদ ইহাদের অফুরন্ত, মনোহরণের শক্তি ইহাদের অপরিমিত। তাহা ছাড়া এগুলির

আরো বিশেষত্ব এই যে, ইহাদের কাব্য-রাজ্য বিশেষ করিয়া 'লিরিক'-এর রাজ্য। কল্পনার স্বচ্ছতা ও অভিনবত্ব, অনুভূতির তীব্রতা এবং প্রসার এ রকমের একটা সৌন্দর্য্য ইহাদিগকে দান করিয়াছে যাহা একান্তভাবেই গীতি-কবিতার সম্পদ। এই কবিতাগুলি পড়িতে পড়িতে 'Golden Book of Modern English Poetry'-র সম্পাদক Thomas Coldwell-এর একটি কথা বার-বারই আমার মনে হইয়াছে। কথাটি এই—"The most significant poetry of our time is either Classical or Romantic in character and not as some critics would have it of the Realistic School." তিনি 'our age' বলিয়া যে সীমা রেখা টানিয়াছেন আমি কেবল সেই সীমা-রেখাটাই তুলিয়া দিয়া বলিতে চাই—তাঁহার কথা কেবল তাঁহার যুগ সম্বন্ধেই সত্য নহে—সমস্ত যুগ সম্বন্ধেই সত্য। বাস্তবিক পক্ষে কাব্যের যাহা সত্য তাহা চিরন্তনের বস্তু। বস্তু-তান্ত্রিকতার রূপ যুগের পর যুগ পরিবর্ত্তন লাভ করে। সুতরাং তাহা শাশ্বত সৌন্দর্য্যের বস্তু হইতে পারে না। যাহা শাশ্বত সৌন্দর্য্যের বস্তু তাহার মূল-গত প্রকৃতি এই জন্যই Romantic বা Classical হওয়া দরকার। সংস্কৃত সাহিত্যে আদি রসের প্রাচুর্য্য সে যুগের সমাজের বস্তু-তান্ত্রিক রূপেরই একটা বাহ্য বিকাশ মাত্র। তাহা সে যুগের সাহিত্যিক মনে একটা দোলাও জাগাইয়াছিল। কিন্তু সভ্যতার সে ধাঁজ বদলাইয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সাহিত্য-রসিকদের কাছে তাহার দামও কমিয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ সত্যকার রস-সাহিত্য যাহা তাহার উপর আধুনিকতার কোনো দাবীই নাই। তাহা জীবনের চিরন্তন সত্যের অভিব্যক্তি বলিয়া এক দিকে যেমন চির পুরাতন, আবার আর এক দিকে তেমনি চির নূতন।

রস-সাহিত্যের এই দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে বৈষ্ণব পদাবলী অতুলনীয়। এরূপ গাঢ় জমাট অনুভূতি এবং সেই অনুভূতির বিচিত্র প্রকাশ আর কোনো গীতি-কবিতায় পড়িয়াছি বলিয়া মনে হয় না। অবশ্য সমস্ত কবিতায় রসের পরিবেশন সমান হয় নাই, এবং সত্য কথা বলিতে গেলে এই কথাই বলিতে হয়—তাহার বেশীর ভাগ কবিতাই মেকি জিনিষ, একটা অত্যন্ত সহজ অনুকরণের ছোঁয়াচে বিবর্ণ ও ম্লান। কিন্তু তাহা হইলেও দুই চারিটি কবিতার ভিতরে রসের যে পরিচয় সমুদ্রের ঢেউ-এর মতো উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে তাহাই পদাবলী সাহিত্যকে চিরদিনের জন্য অমর করিয়া রাখিবে।

বাঙালী পাঠকের সহিত পদাবলী সাহিত্যের পরিচয় আছে, কিন্তু সে পরিচয় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সুরের ভিতর দিয়া—ভাষার ভিতর দিয়া নহে। যে ভাষা সাধারণ বাঙালী পাঠক পড়িয়া রস গ্রহণ করিতে পারে পদাবলীর অনেক কবিতার ভাষাই সে ভাষা নহে। সুতরাং সেগুলির একটা তর্জ্জমার সত্যকার প্রয়োজন আছে বলিয়া আমার মনে হয়। অবশ্য পদাবলী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি যিনি সেই চণ্ডীদাসের ভাষা পুরা দস্তুর বাংলা—এবং কোনো কোনো স্থলে একেবারে হুবহু আধুনিক বাংলার মতোই। তাই অত্যন্ত লোভ সত্বেও 'মণিদীপা'র ভিতর হইতে এই মহাকবির রচনাকে নির্ব্বাসিত করিতে হইয়াছে। কারণ 'মণি-দীপা' অনুবাদ-গ্রন্থ। এই খানেই আরও একটি বিষয়ের কৈফিয়ৎ দেওয়া হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। সে কৈফিয়ৎটি জয়দেবের সম্বন্ধে। জয়দেবের শ্লোক সংস্কৃত ভাষায় রচিত। তথাপি তাঁহাকে সংস্কৃত কবিদের ভিতর স্থান না দিয়া আমি বৈষ্ণব কবিদের ভিতর স্থান দিয়াছি। ইহার কারণ সুস্পষ্ট। বৈষ্ণব কবি হিসাবেই জয়দেবের খ্যাতি ও গৌরব। অন্যত্র তাঁহাকে স্থান দিলে আমার বিবেচনায় তাঁহাকে অনর্থক অপাংক্তেয় করা হইত।

কিন্তু জয়দেবকে বৈষ্ণব সাহিত্যের ভিতরে ঠেলিয়া দিলেও কবিতার স্থান নির্দ্দেশে আমি বিশেষ কোনো রীতির অনুসরণ করি নাই। বিষয়-বস্তু বা রচনার সময়—এই দুইটির একটিকে অনুসরণ করিয়া সাজানোই সাধারণ পদ্ধতি। কিন্তু আমার মনে হয়—বিশেষ কোনো কবির রচনা সম্বন্ধে এই পদ্ধতি যদিও বা অনুসরণ করা চলে—এ ধরণের সংগ্রহ-গ্রন্থে তাহার উপর খুব বেশী জোর দিবার প্রয়োজন নাই। যাহা এখান ওখান হইতে সংগৃহীত, তাহাকে এখানে ওখানে সেখানে বসাইয়া দিলেও ক্ষতি হয় না, যদি সাধারণ ভাবে তাহার দ্বারা একটা atmosphere বা আবেষ্টনের সৃষ্টি করা যায়।

'মণি-দীপা'য় সাঁওতালী, কোচ প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষায় রচিত কতকগুলি কবিতার অনুবাদও দেওয়া হইয়াছে। ইহাদের সৌন্দর্য্য সংস্কৃতের ঠিক উল্টা—একেবারে সব রকমের অলঙ্কার-বর্জ্জিত। ভূষণ-বাহুল্য নাই—কিন্তু সুপুষ্ট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের, উপচীয়মান স্বাস্থ্যের যে সৌন্দর্য্য, এই সব প্রাদেশিক কবিতায় তাহা পর্য্যাপ্ত পরিমাণেই আছে। ইংরাজীতে Pastoral Poems-এর যে সমাদর আছে, আমাদের দেশে তাহা নাই। আমাদের দেশের শিক্ষার ভিতর এমন একটা কৃত্রিমতা আসিয়া পড়িয়াছে যাহার জন্য যাহা স্বাভাবিক, যাহা সহজ তাহা আমাদের মনে সাড়া জাগায় না। শিক্ষার ভিতর দিয়া

রক্তের ধারা যেমন সহজে বহিয়া চলে—রস-ধারাও এই সব কবিতার ভিতর দিয়া তেমনি সহজ ভাবে বহিয়া যায়। আইরিশ কবি ইয়েট্‌স আয়রল্যাণ্ডের Pastoral কবিতাকে আধুনিকতার ছাঁচে ঢালিয়া একটা নূতন রূপ দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার বাঁশীতে যে সুর বাজিয়াছে তাহার সৌন্দর্য্যে রসিক জনের মন আজ দোলায়মান। বাংলাতেও এই ধরণের একটা চেষ্টা হওয়ার প্রয়োজনীয়তা বাংলা-সাহিত্যের অতি-কৃত্রিম আবহাওয়াই আনিয়া দিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

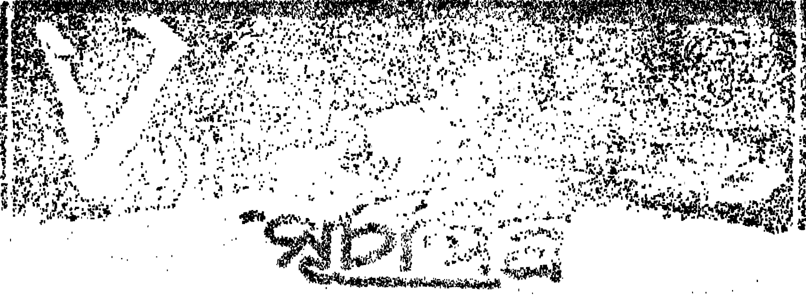
এইবার ছন্দ সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়া আমার এই নিবেদনের পালা শেষ করিব। কাব্যের ছন্দ বিষয়-বস্তুর উপযোগী হওয়া আমি অপরিহার্য্য বলিয়াই মনে করি। প্রকাশ-ভঙ্গি বা style বা form-এর উপরে কবিতার সৌন্দর্য্যের ষোলো না হইলেও বারো আনা অন্ততঃ নির্ভর করে—ইহাই আমার বিশ্বাস। হাল্‌কা ছন্দে গুরু ভাবকে প্রকাশ করিলে, বা হাল্‌কা ভাবকে গুরু ছন্দে প্রকাশ করিলে ধ্বনি-জগতে যে তাল-ভঙ্গ হয় তাহা সমস্ত কাব্য-জগতকেই সচকিত করিয়া তোলে। এই কারণেই আমি যথা-সাধ্য চেষ্টা করিয়াছি ভিতরের ভাবের সহিত বাহিরের ধ্বনির সামঞ্জস্য বজায় রাখিবার জন্য। কোনো কোনো কবিতায় মূলের ছন্দ অনুসরণ করিতেও চেষ্টা করিয়াছি। যেমন মেঘদূত বা জয়দেবের 'বদসি যদি কিঞ্চিদপি' প্রভৃতিতে। ছন্দ অনুসরণ করা অর্থ ইহা নহে যে, সংস্কৃতের লঘু গুরুর নিয়ম বাংলার স্বরের ঘাড়ে চাপানো হইয়াছে, তাহার মানে ছন্দের গতি-বেগ বা সুর ধরিতে চেষ্টা করা হইয়াছে উচ্চারণের ভঙ্গির ভিতর দিয়া। সংস্কৃত ছন্দকে বাংলায় আনিতে গেলে তাহা বাংলার বৈশিষ্ট্য হারাইয়া ফেলে সাধারণতঃ ইহাই সুধী জনের বিশ্বাস। আমার তর্জ্জমায় সে দোষ আসিয়া পড়িয়াছে কি না তাহার বিচারের ভার আমি পাঠকবর্গের উপরই অর্পণ করিতেছি।

'মণি-দীপা' যদি সুধী পাঠকবর্গকে আনন্দ দিতে পারে, তবে তাহা আমি আমার সৌভাগ্য বলিয়াই মনে করিব। আর যদি না পারে তবে তাহার জন্য দোষ আমি তাঁহাদের ঘাড়ে চাপাইব না যাঁহাদের কবিতার তর্জ্জমা এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। এ কথা আমি নিঃসঙ্কোচেই স্বীকার করিতেছি যে, যেখানেই রসের পরিবেশনে দীনতা আসিয়া পড়িয়াছে, তাহা আসিয়াছে আমারই অক্ষমতার জন্য, আর কেহ তাহার জন্য দায়ী নহেন।

এই গ্রন্থ প্রকাশ সম্বন্ধে আমি অনেকের কাছে ঋণী। তাঁহাদের ভিতর সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী, ইণ্ডিয়ান প্রেসের কর্ণধার শ্রীযুক্ত

হরিকেশব ঘোষ ও বিখ্যাত শিল্পী শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রভৃতির নাম বিশেষ ভাবেই উল্লেখ-যোগ্য। প্রমথ বাবু স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এ গ্রন্থের একটি সুন্দর ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। তাঁহার এই অনুগ্রহ এ গ্রন্থের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে। ইহার অধিকাংশ ছবিই শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর অঙ্কিত। এই অঙ্গরাগ রচনার জন্য বন্ধুত্বের বহু অত্যাচার তাঁহাকে সহ্য করিতে হইয়াছে। কিন্তু শ্রীযুক্ত হরিকেশব বাবুর নিকট হইতে লাভ করিয়াছি আমি ইহার প্রকাশের অনুপ্রেরণা এবং ইহার বাহিরের গড়ন সম্বন্ধে নানা রকমের উপদেশ। বস্তুতঃ 'মণি-দীপা'র অঙ্গ-সৌষ্ঠব ও বহিরাবরণের প্রায় সমস্ত পরি-কল্পনাই হরিকেশব বাবুর। ইঁহারা ছাড়াও ছাপার সৌষ্ঠবের দিক দিয়া আমাকে অক্লান্ত ভাবে সাহায্য করিয়াছেন ইণ্ডিয়ান প্রেসের অন্যতম সত্ত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত হরিসাধন ঘোষ ও তাঁহার সহকর্ম্মী শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য। শিল্পী শ্রীযুক্ত রামগোপাল বিজয় বর্গীয়ের কয়েক খানা ছবিও ইহার অঙ্গ-সৌষ্ঠব বৃদ্ধির সাহায্য করিয়াছে। এই যে অযাচিত সব সাহায্য— ইহার ঋণ তুচ্ছ কথার বুদ্বুদে শেষ হইবার নহে। তাহা আমার অন্তরের অন্ত-স্তলে গাঁথা রহিল। তাঁহাদের সকলকেই আমি অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতার দ্বারা অভিনন্দিত করিতেছি।

কলিকাতা।
চৈত্র-সংক্রান্তি, ১৩৩৮



সংস্কৃত

সূচীপত্র

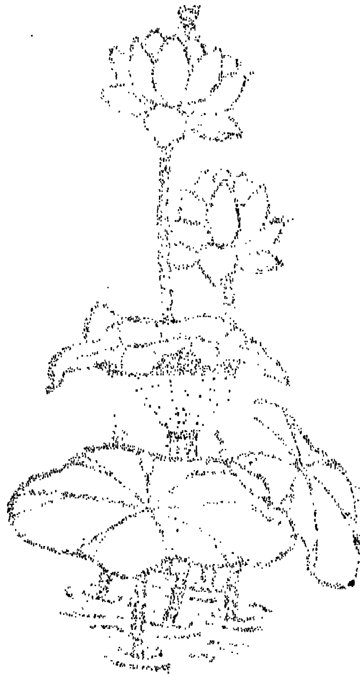
হিন্দী

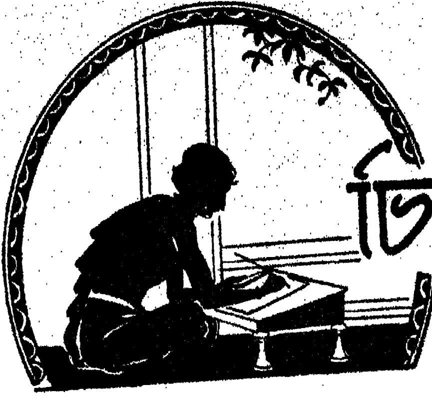
সূচীপত্র

বৈষ্ণব

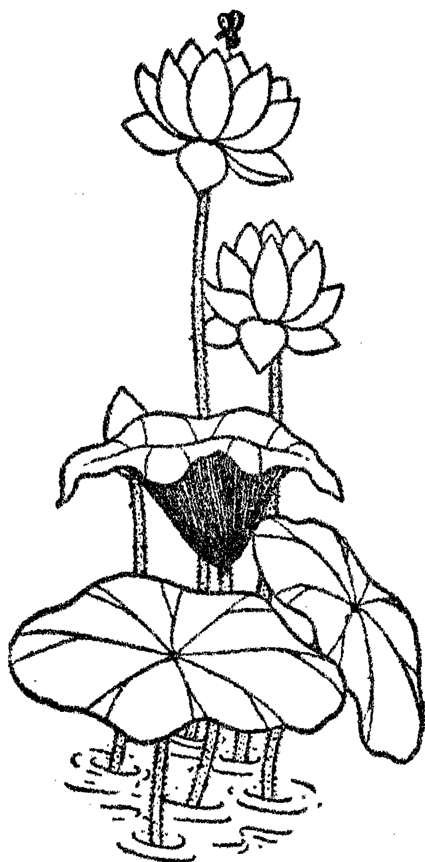
বিবিধ

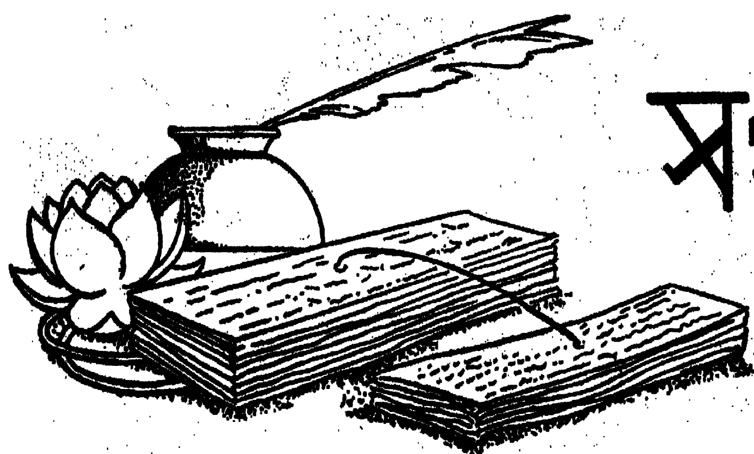
সূচীপত্র





চিত্র-সূচি





সংস্কৃত



সাহিত্য-পরিষদ গ্রন্থাগারকে দিলাম

১২-১২-৩৭



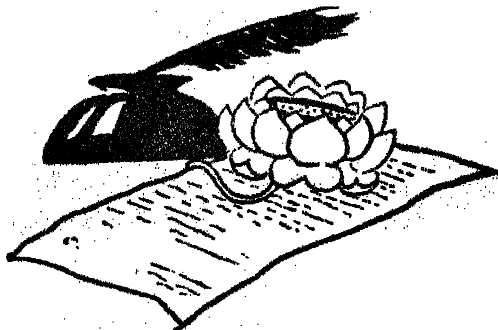
সরস্বতী

নিত্য মোদের শুদ্ধ করেন যে দেবী সরস্বতী,
সব ঋদ্ধিতে সমৃদ্ধ অন্তর,
সত্তা যাঁহার জ্ঞানের দীপ্তি, অপার বুদ্ধিমতী—
তাঁর কাছে চাহি যজ্ঞ-সিদ্ধি বর।

সত্যবাণীর প্রেরণায় তিনি জাগান মর্ম্মময়,
করেন শুদ্ধ চিন্তার উন্মেষ,
জ্ঞানের সূক্ষ্ম অনুভূতি তাঁর কৃপায় বাক্যময়—
সরস্বতীই ধরেন যজ্ঞ-শেষ।

পরমাত্মার মহাঅর্ণব স্ফুরণের চেতনায়
উদ্বেলি' উঠে বুদ্ধির রেখাপাতে,
বিপুল বিশ্ব ভরিছে শুদ্ধ জ্যোতির মূর্চ্ছনায়—
আলোর পতাকা সরস্বতীর হাতে।

ঋগ্বেদ





প্রার্থনা

বর্ণ যাঁহার কুন্দ কুসুম,
তুষার এবং চন্দ্ররে,
শুভ্র শুচি বসন যাঁহার অঙ্গে,
হস্তে যাঁহার পায় শোভা ঐ
বীণার বর দণ্ডরে,
শ্বেত শতদল আসন গড়ে রঙ্গে ;

বিষ্ণু বিধি মহেশ্বর
যাঁরে করেন বন্দনা,
দেব্‌তারা যাঁর ধ্যানে মগন নিত্য,
নিঃশেষেতে নষ্ট করেন
সব জড়তার লাঞ্ছনা,
সেই বাণী মোর শুদ্ধ করুন চিত্ত।

অজ্ঞাত





অমৃত-কামনা

বাতাস ভরিয়া ঝরুক অমৃত ধারা,
নদীর সলিলে অমৃতের হিল্লোল,
ওষধির দল—অমৃত ঝরাক্ তারা,
হোক্ মধুময় ঊষা-সন্ধ্যার দোল।
ধরণীর ধূলি মধুতে ভরিয়া যাক্,
আকাশ উঠুক মধুর ধারায় ভরি',
বনস্পতির বুকে মধু জ'মে থাক্,
সূর্য্য কিরণে অমৃত পড়ুক ঝরি'।
ধেনুদের দুধ—সেও হোক্ মধুময়,
সব হোক্ মধু, মধুময় সমুদয়।

ঋগ্বেদ





রুদ্র-বন্দনা

দেবতাদিগের জন্ম এবং
প্রতিষ্ঠা যাঁর বরে,
যে মহাতাপস প্রাণ দিয়েছেন
হিরণ্যগর্ভরে,
এই বিশ্বের অধিরাজ যিনি
রুদ্র জ্যোতিষ্মান,
আমাদের মনে তিনিই করুন
শোভন বুদ্ধি দান।

*

অতুলন যিনি বর্ণ-রহিত,
শক্তির উচ্ছ্বাস,
বহুরে সৃষ্টি করিয়াছে যাঁর
সুগোপন অভিলাষ,





জগৎ যাঁ'হ'তে লভেছে জন্ম,
ফের যাঁ'তে পা'বে লয়,
সেই দেবতাই দিন আমাদেরে
বুদ্ধি কুশলময় ।



গিরির শিখরে নিবাস যাঁহার,
সৃষ্টি করেন সুখ,
অভয় এবং মঙ্গল যাঁর
দেহ-তটে উন্মুখ,

রুদ্র যাঁহার তনুতে তনুতে
পুণ্যের অভিঘাত,
সেই রুদ্রই আমাদের পানে
করুন দৃষ্টিপাত ।



হে গিরিশন্ত, হস্তে তোমার
দীপ্ত বজ্র জ্বলে,
ঐ বজ্রের অগ্নি জাগায়
প্রলয় বিশ্বতলে ।





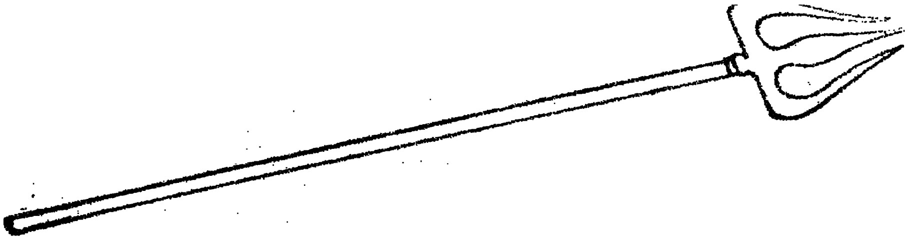
মিনতি মোদের, ধ্বংসের তরে
উহারে হেনো না আর,
রুদ্র, ধরার রক্ষায় করো,
বজ্রের ব্যবহার।

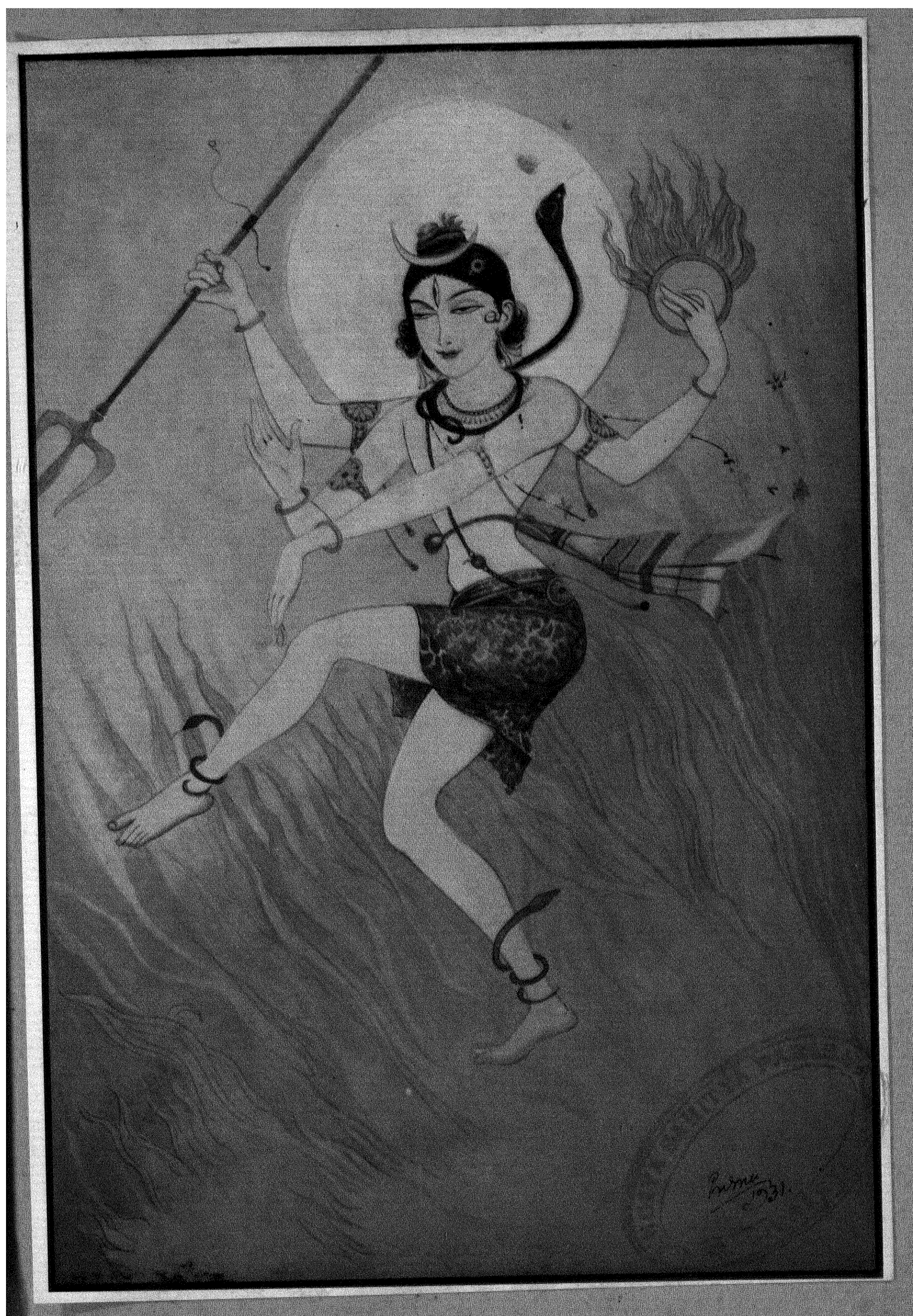


রুদ্র, মোদের পুত্র-পৌত্রে
ধ্বংস হানিয়ো নাকো,
সবল ভৃত্য, গাভী ও অশ্বে
জীবনে বাঁচায়ে রাখো।

ক্রুদ্ধ হ'য়োনা আমাদের পরে,
হ'রো না কাহারো প্রাণ,
হব্যে তোমার অর্ঘ্য সাজায়ে
পূজা করিতেছি দান।

শ্বেতাশ্বেতরোপনিষৎ



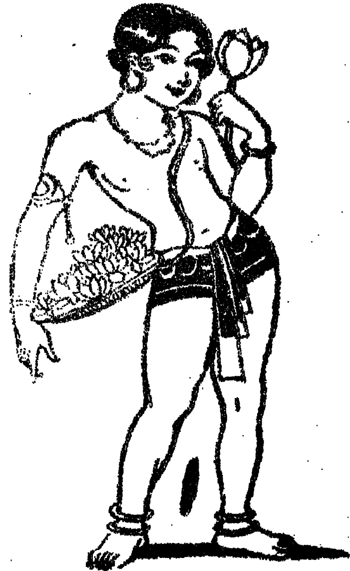




কুহক-মন্ত্র

আলয়ে আমার মন্ত্র-মায়ার বলে
ঐক্যের সুখ শান্তি উঠিবে জাগি',
কেহ কারো পানে তাকাবে না ঘৃণা ছলে,
পরস্পরের র'বে চির অনুরাগী।
মন্ত্রে আমার—পুত্র রহিবে নত,
পিতা ও মাতার নির্দ্দেশে দিবে হিয়া,
সুন্দরী বধূ—দীপ্ত শিখার মতো—
দয়িতে তুষিবে মধুর বাক্য দিয়া।
ভা'য়ে ভা'য়ে হ'বে বিদ্বেষ-বিষহীন,
বোনে বোনে কোনো তিক্ততা নাহি র'বে,
মিষ্ট বাক্যে কেহ নাহি হ'বে দীন—
মন্ত্র প্রভাবে সব হিয়া এক হ'বে।

অথর্ব্ববেদ



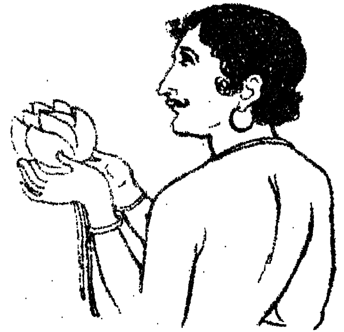


ঊষা-স্তুতি

আলোর দেবতা—অমর দুহিতা,
হে ঊষা, তোমারে স্মরণ করি,
তরুণ তোমার অরুণ অশ্ব—
এসো তুমি তারি বিমানে চড়ি'।

কোন্ অজানার পরপারে থাকো—
কোথা—কত দূরে জানে না কেহ,
তুমি বিদ্যুৎ এঁকে যাও নভে,
দীপ্তিতে ভরে মর্ত্ত্য-গেহ।

অধরে তোমার লীলায়িত হাসি,
ঝরে যৌবন সকল গায়,
মুখে আর বুকে জ্যোতির ঝলক,
আলোর পুলক অলকে ভায়।



ঝনী-দীপা

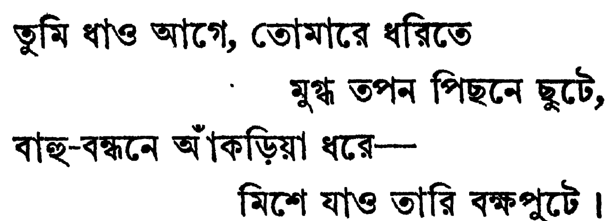
রূপ তব সেই রমণীর মতো
নিভৃত নদীতে অঙ্গ ধু'য়ে,
যৌবন যার ঘন হ'য়ে উঠে—
ঝ'রে পড়ে দেহ-বৃন্ত চু'য়ে।

রূপ তব সেই নবোঢ়ার মতো
দীপ্ত ভূষণে তনু যে ঢাকে,
দয়িতের স্মিত নয়নে গর্ব্বে
যে তার কুহক ছড়ায়ে রাখে।

রূপ তব সেই কুমারীর মতো
যে নিজ রূপের শক্তি জানে,
নয়নের কোণে মায়ারে ছড়ায়,
জিনে' নেয় হিয়া চোখের বাণে।

নৃত্য-নিপুণা নটিনীর মতো
রূপ ঝরে তব অঙ্গ হ'তে,
বুকের বসন খুলে' ফেলে দাও,
ধরা ভ'রে উঠে আলোর স্রোতে।





তুমি ধাও আগে, তোমারে ধরিতে
মুগ্ধ তপন পিছনে ছুটে,
বাহু-বন্ধনে আঁকড়িয়া ধরে—
মিশে যাও তারি বক্ষপুটে।

তুমি বেঁচে আছ যুগ যুগ হ'তে,
নিত্য লভিছ জন্ম নব,
প্রবীনাও তুমি—নবীনাও তুমি,
কে পায় রূপের অন্ত তব ?

দিবসের পর দিবস মিলায়,
চক্র তোমার ঘুরিয়া চলে,
তারি সাথে সাথে মোদের জীবন
মিশে' যায় মহাকালের তলে।

বুড়া ছিল যারা গুঁড়া হ'য়ে গেছে,
ঝরিয়া মিলায় আজের যারা,
পরে আসে যারা তারাও মিলাবে,
হায় সৃজনের এমনি ধারা !





গত, অনাগত, বর্ত্তমানের
ধ্বংস সবারি সুনিশ্চয়,
চির যৌবনা হে অমরী ঊষা,
নাই—শুধু নাই তোমারি ক্ষয়!

বহিন তোমার গহিন রজনী—
তার গুণ্ঠন অন্তরালে,
ক্ষীণ তারকার রশ্মির লেখা
ঘন রহস্য-দীপ্তি জ্বালে।

তুমি এসো আর তোমার আলোকে
পর্দ্দা তাহার মিলায়ে যায়,
ধরণীর ছায়া লভে নব কায়া,
রাত্রি মিলায় দিনের গায়।

জীবিত যাহারা তাদের জীবন—
ফেরো নিঃশ্বাস সঞ্চারিয়া,
দর্শন তব দিশাহারা করে,
শক্তির আঁচে ভরে সে হিয়া।



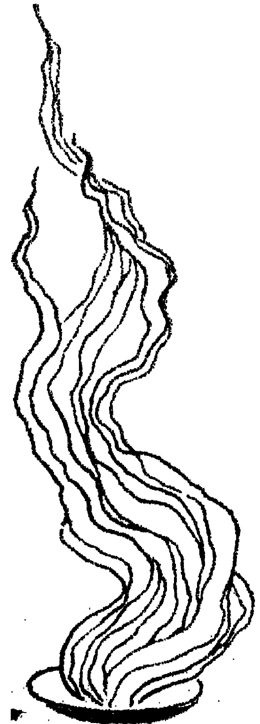


আঁধার চিরিয়া জ্যোতিরে ঝরাও,
পাখা ঝাপটিয়া পাখীরা জাগে,
মৃত্যুর মতো মোহ টুটে' যায়
নয়নে যেমনি দীপ্তি লাগে।

অন্ধকারের পরপারে মোরা,
অপগত সব মোহের মায়া,
প্রেয়সীর মতো বিকশিত দেহ—
হাসিয়া নিয়েছ মুছিয়া ছায়া।

ঘুমে ছিল যারা উঠেছে জাগিয়া,
দিকে দিকে জাগে অন্বেষণ,
অন্নের লাগি' জেগে উঠে কেহ,
অর্থরে খোঁজে কাহারো মন।

মহাযজ্ঞের অগ্নি জ্বালায়ে
মন্ত্ররে কেহ মূর্ত্ত করে,
দেবতা—তারাও অর্ঘ্য লভিছে
হে তরুণী ঊষা, তোমার বরে!





নিত্য-নবীনা, চির-যৌবনা,
হে দেবতা, অয়ি আকাশবাহী,
তোমার আলোক আকাশে জ্বলিছে,
তোমার আলোক হৃদয়ে চাহি।

দাও তব আলো, তারি সাথে দাও
সুখ-সম্পদ-স্বাস্থ্য আর,
সব দীপ্তির শ্রেষ্ঠ দীপ্তি,
হে উষা, তোমারে নমস্কার !

ঋগ্বেদের অনুসরণে





বিমলা

সৌন্দর্য্যের শতদল দেহ-বৃন্তে উঠেছিল ফুটি',
নিখুঁৎ সে তনু-দেহ—তারি লাগি' ধরণীর লোক
দিয়েছে পূজার অর্ঘ্য। যৌবনের স্পর্দ্ধা মদে লুটি'
ভেবেছি—পেয়েছি কাম্য ; খুঁজি নাই সত্যের আলোক
সেদিনের তৃপ্তি ছিল শুধু বেশ—শুধু প্রসাধন,
লেপিয়াছি দেহ-তট গন্ধ-পঙ্কে, সৌষ্ঠবের ভারে,
শিকারে বাঁধার লাগি' শিকারীর শত আয়োজন,
কত মন হারায়েছে পতিতার ক্লেদাক্ত দুয়ারে !
পেতেছি অব্যর্থ ফাঁদ বাহিরে দেখিতে অপরূপ,
বসন দিয়েছি খুলে' বিকশিয়া নগ্ন তনুতল,
নির্ল্লজ্জ কামনা-মোহে পুড়িয়াছে প্রমত্ত মধুপ,
মিটে নাই ক্ষুধা তবু—তবু অগ্নি হয়নি শীতল।



মণিদীপা

মুণ্ডিত মস্তক আজ। গেরুয়ায় ঘিরিয়াছি কায়,
ভিক্ষা মাগি' দ্বারে দ্বারে বাহি' চলি' জীবনের পথ,
বিশ্রামের কুঞ্জ রচি অরণ্যের বিটপীর ছায়,
আনন্দ এসেছে তবু—এ আনন্দ নহে উল্কাবৎ।
বন্ধন-বিমুক্ত মন; যে বন্ধন কঠিন ভয়াল
দেবতা মানুষে বাঁধে—কোনোখানে নাহি তার চিন,
শান্ত বুদ্ধি, মিটিয়াছে মত্ততার দুর্দ্দান্ত খেয়াল,
পেয়েছি পরমা তৃপ্তি—নির্ব্বাণের আসিয়াছে দিন।

বৌদ্ধ থেরীগাথা



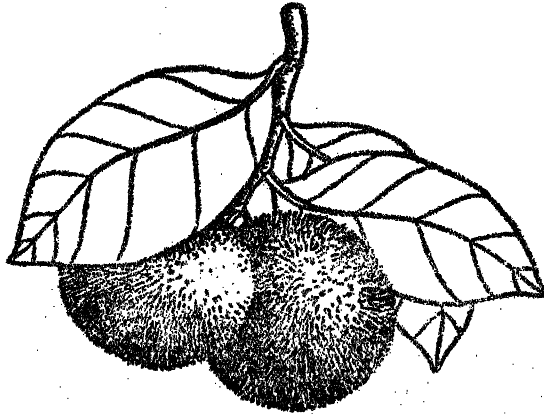


উত্তর মেঘ

বিদ্যুৎ স্পন্দন তোমাতে অনুখন, রম্যা নারী তার হর্ম্ম্যে ভায়,
ইন্দ্রের কার্ম্মুক তোমাতে শোভে মেঘ, দীপ্ত ছবি তার প্রাচীর গায়,
গম্ভীর গর্জ্জন-স্তনিত বুক তব, মুরজে মুখরিত সে গৃহতল,
অভ্রের অন্তর সৌধ ছোঁয় তারো—তুমিই অলকার তুলনা স্থল!

পদ্মের পল্লব হস্তে বধূদের, কুন্দে ঝলমল অলকদাম,
লোধ্রের চূর্ণের স্পর্শে পাংশুল-মুখের তাহাদের সহজ ঠাম।
কর্ণের সম্পদ শিরীষ সুকুমার, নবীন কুরুবক চূড়ার পর,
বর্ষার ঝর্ণায় যে নীপ ফুটায়েছ, ললাটে দোলে তারি মাল্য-থর।

পুষ্পের পর্ণের স্ফুরণ অবিরাম—সেখানে বিহ্বল ভ্রমর গায়,
নিত্যারবিন্দের বৃন্ত কুসুমিত, হংস-মিথুনের মেখলা তায়।
উজ্জ্বল ভাস্বর বর্হ দেহে যার ভবন-শিখি সেই গাহিছে গান,
রাত্রির উৎসব আঁধার ঘুচায়েছে, নিত্য জ্যোৎস্না প্রবহমান।





অশ্রুর নির্ঝর হর্ষে উথলায়—তা ছাড়া সেথা আর অশ্রু নেই,
মন্মথ সন্তাপ কেবল তাপ তার—সে তাপও শেষ হয় প্রিয়াগমেই।
নেই যার অর্থ ই—কলহ প্রণয়ের, বিরহ শুধু তাই সেখানকার,
উন্মুখ যৌবন—তা ছাড়া যক্ষের জানে না কেহ কোনো বয়স আর।

স্বেচ্ছায় সৈকত-স্বর্ণ-রেণুকায় হারায় মণি সেথা তরুণীগণ,
সন্ধান ফের তার খেলার ছলে করে,—লীলায় দেবতারো ভুলায় মন
গঙ্গার উচ্ছল শীকর সুশীতল জুড়ায় তাহাদের গ্লানির ছাপ,
মন্দার পত্রের স্নিগ্ধ চাঁদোয়ায় নিমিষে ঘুচে' যায় আতপ তাপ।

বিম্বের রক্তের রেখাটি ঠোঁটে যার, সেথা সে কান্তার নীবীর বাস
বন্ধুর চঞ্চল লুব্ধ করতল নিভৃতে হরণের জাগায় ত্রাস,
লজ্জায় পাণ্ডুর বধূরা শিথানের প্রদীপ শিখাটায়—লভিতে ত্রাণ—
কুঙ্কুম চূর্ণের মুষ্টি হানে হায়, তবুও রহে তারা অনির্ব্বাণ!

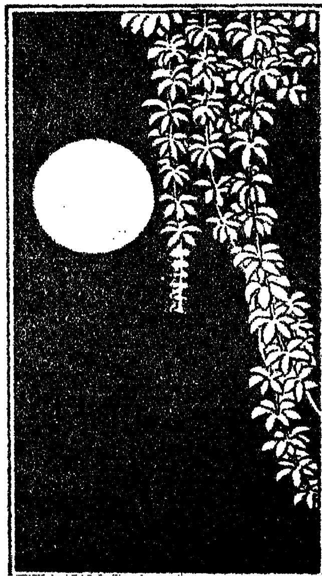


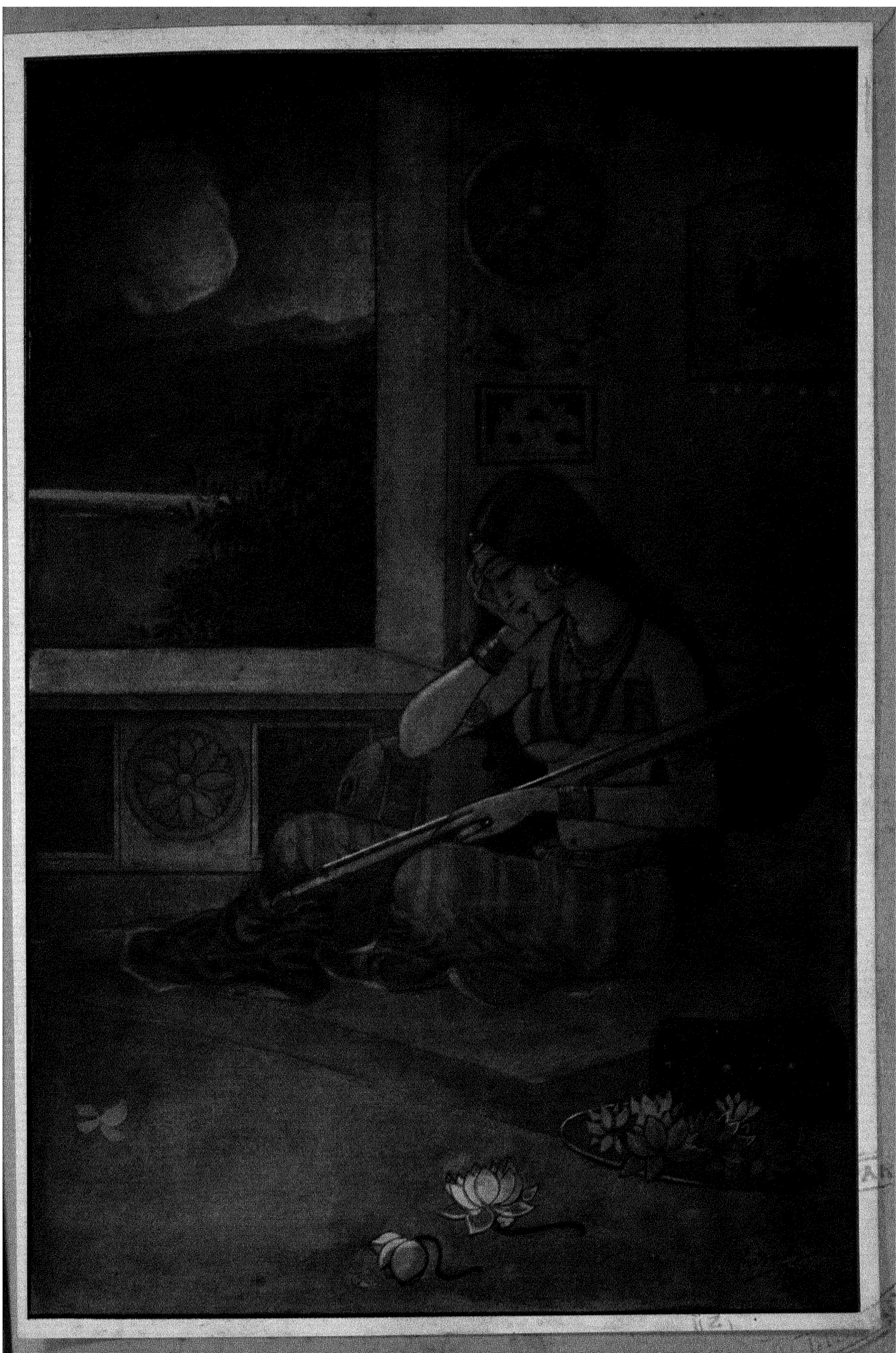


কুন্তল-বন্ধন-ভ্রষ্ট মন্দার, ভ্রষ্ট কর্ণের কমল আর,
বক্ষের বৃন্তের গন্ধে সুরভিত ছিন্ন বিকীর্ণ মুক্তা হার,
নিশ্চিত ইঙ্গিত করিছে সেই সব অভিসারিকাদের নৈশ পথ,
সূর্য্যের রশ্মির আঘাতে জেগে যারা ছুটেছে গৃহপানে তড়িৎবৎ।

যক্ষেশ সৌধের অদূরে অলকায় বন্ধু, বিরাজিত আমার ঘর,
মসৃণ বঙ্কিম তোরণ তল তার—সহজে পড়ে চোখ তাহার পর।
সুন্দর মন্দার প্রান্তে শোভা পায়, কান্তার কৃত্রিম পুত্র সেই,
হস্তেই পুষ্পের গুচ্ছ মেলে তার—নিয়ত রহে নত মস্তকেই।

কাঞ্চন যার রঙ্, দন্ত তুষারের, তন্বী, ঠোঁটে যার বিম্ব লীন,
নেত্রের প্রেক্ষণ চকিত হরিণীর, গভীর নাভি আর কটি সে ক্ষীণ,
জঙ্ঘার আওতায় অলস গতি যার, তনুরে নোয়ায়েছে স্তনের ভার,
স্রষ্টার সৃষ্টির প্রথম যুবতী যে—বন্ধু, পাবে সেথা দেখাটি তার।





মণিদীপা

বাক্যের নির্ঝর শুষ্ক মুখ পর—আমার প্রিয়া—মোর দ্বিতীয় প্রাণ,
বন্ধুর বিচ্ছেদ—চক্রবাকী হায় একাকী করে সেথা অবস্থান।
নেই ক্ষয়—নেই ভাঁজ দিবস তার আজ, গভীর উদ্বেগ চিত্তময়,
শৈত্যের বর্ষায় নলিনী ম্লান হায়, জ্বলেও গেছে রূপ সুনিশ্চয় !

নিঃসীম অশ্রুর জোয়ারে প্লবমান প্রিয়ার বুঝি দু'টি নেত্র পুট,
নির্ম্মম নিঃশ্বাস ওষ্ঠ অধরের রক্তরাগ—তাও করেছে লুট।
মুখময় আলুগোছ অলক এলায়িত, সেখানে বিকশিত নাই সে ভাব,
চন্দ্রের জ্যোৎস্নাও ম্লান যে হয় মেঘ, তোমার ছায়া যবে করে সে লাভ!

অঙ্গেও ক্ষৌমের শোভা সে নাহি আর—হয়তো নামে মোর রচিয়া গান,
সঙ্গীত চেষ্টায় উরুতে বীণা রাখি' কেবলি তারে তার দিয়েছে টান,
নেত্রের বন্যায় সহসা ভিজে' যায় বীণার বুকে তার তন্ত্রীটাই,
প্রাণপণ যত্নেও প্লাবন থামে যদি—মনে না পড়ে আর মূর্চ্ছনাই !





বিচ্ছেদ দণ্ডের স্থরু সে হ'তে হায় নিত্য রাখে প্রিয়া একটি ফুল,
দুর্ব্বহ দুঃখের কবে যে হ'বে শেষ বুঝি সে ফুল গণি' ভাঙ্গিছে ভুল।
সঙ্গের আস্বাদ দেখিবে হয়তো বা, লভিছে সে আমার কল্পনায়,
সঙ্গম-তীর্থের প্রসাদ করে লাভ অনেক বিরহিণীই স্বপ্নে হায়।

পাণ্ডুর চন্দ্রের রেখার মতো শুধু—সকল কলা ক্ষয়ে যবে সে ক্ষীণ,
নির্জ্জন শয্যার আঁকড়ি এক পাশ বিরহাতুরা প্রিয়া বুঝি বা লীন।
উদ্দাম সম্ভোগ ক্ষণিক পল সম মিলায়ে দিত বায় আগে যে রাত,
বিচ্ছেদ নির্ঘাত করেছে বড় আজ—শোকের জলে তার হয় প্রভাত!

সস্মিত্ ইন্দুর অমৃত কর জাল জানালা পথে মেলে নয়ন যেই,
পূর্ব্বের হর্ষের পুলকে ছুটে' যেতে সহসা থামে প্রিয়া দ্বারান্তেই।
অশ্রুর ঝর্ণার বিপুল জল ভার পক্ষ্ম ছেয়ে ঝরে—দেখায় হায়
অর্দ্ধেক তন্দ্রায় আধেক জাগরণে দুর্দ্দিনের স্থল কমল প্রায়!





অঙ্গের সৌষ্ঠব—ভূষণ নাহি আর—ক্ষীণা সে আরো ক্ষীণ সহিয়া দুখ,
শয্যার গাত্রেই এলায়ে প'ড়ে আছে, পেলব বুক আর শুষ্ক মুখ।
নিশ্চয় ঝর্ ঝর্ ঝরিবে আঁখি তব তাহার পানে চেয়ে বন্ধু মেঘ,
অন্তর আত্মার আর্দ্র যাহাদের রুধিতে নারে তারা দুঃখাবেগ!

কুন্তল চূর্ণের বাধায় প্রতিহত দৃষ্টি-সুধা তার অপাঙ্গের,
অঞ্জন বর্জ্জন, মদ্যে নাই মন, ভ্রূতলে নাই আর বিলাস ফের!
নেত্রের স্পন্দন সে মৃগ-নয়নার জাগিবে যদি তুমি নিকটে যাও,
মৎস্যের বিক্ষোভ দোলায় কুবলয়—দৃষ্টি হানিবে সে বঞ্চিতাও।

নিদ্রায় নিঃসাড়—যখন যাবে মেঘ—দেখিতে যদি পাও প্রিয়ায় মোর,
কণ্ঠের গর্জ্জন ক্ষণেক চেপে রেখো, ভেঙো না তার সেই স্বপ্ন ঘোর।
তন্দ্রার মধ্যেই হয়তো সে আমার কণ্ঠে জড়ায়েছে বাহুর ফাঁস,
হস্তের গ্রন্থীর গাঢ় সে বন্ধন—শিথিল ক'রো নাকো সে ভুজ-পাশ।

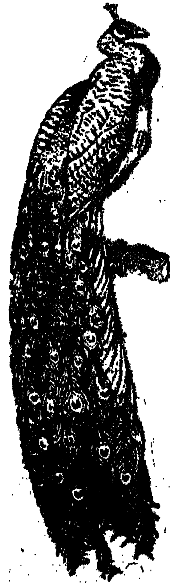


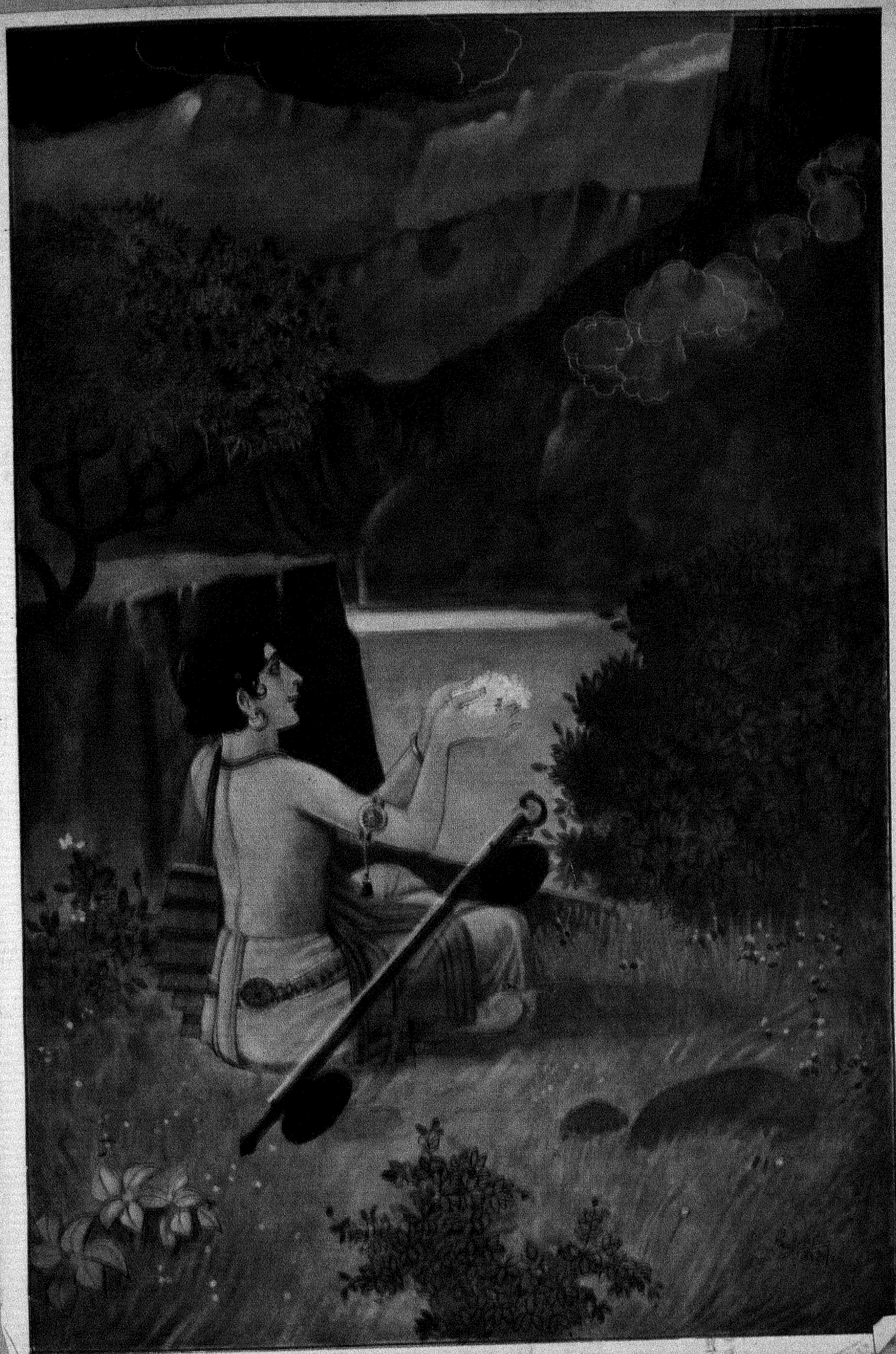


বক্ষের বাষ্পের শীকর-ভেজা বায় বুলায়ে দেহে তার ভাঙায়ো ঘুম,
আশ্বাস বাক্যের অর্ঘ্যরূপে দিও নবীন মালতীর সুরভি ধূম।
বিস্ময়-বিহ্বল নেত্র তুলি' তার দাঁড়াবে প্রিয়া মোর জানালা পর,
গর্ব্বের বিদ্যুৎ আবরি' বন্ধু হে, শুনায়ো তুমি তারে মন্দ্র স্বর।

'বিহ্বল ভর্ত্তার বন্ধু আমি তব'—কহিয়ো তুমি তারে—'শঙ্কা নাই,
সংবাদ সব তার বক্ষে বহি' আজ এনেছি অবিধবে, তোমার ঠাঁই।
কুন্তল-বন্ধন প্রিয়ার মোচনের কান্ত যারা হায় সমুৎসুক,
গম্ভীর শব্দের তাগিদে তাহাদের আমিই ভ'রে দিই শ্রান্ত বুক।'

নেত্রের ঈক্ষণ হরিণে পাই তার, অঙ্গ-সৌষ্ঠব শ্যামা লতায়,
চন্দ্রের জ্যোৎস্নায় মুখের ছায়া পাই, অলক—শিখিনীর বর্হ গায়,
হিল্লোল-হিন্দোল নদীর লীলায়িত আভাস দেয় তার ভ্রূভঙ্গের,
নিঃশেষে এক ঠাঁই কেবল নাহি পাই—জানায়ো তারে এই গ্রহের ফের!







চিন্তার বন্যায় চিত্ত ডুবে' যায়—আপনি আপনায় প্রবোধ দেই,
দুঃখের ঘূর্ণীর পীড়নে উঁচু শির বুঝায়ে দিয়ো তারে নোয়াতে নেই।
নির্মেঘ হর্ষের, শুদ্ধ দুঃখের ধারা সে হেথা কেহ করে না ভোগ,
ভাগ্যের চক্রের গতি সে অবিরাম—কখনো আসে সুখ, কখনো শোক।

মিত্রের সন্তোষ বিধান তরে হোক্, কিম্বা ভাবি মোর গভীর ক্লেশ,
অন্যায় ভিক্ষাও এ যদি হয় মেঘ, কৃপায় ক'রো মোর ব্যথার শেষ।
বর্ষার সঙ্গেই হর্ষে তারপর প্রার্থিত দেশে ক'রো নিত্য বাস,
বিদ্যুৎ-বিচ্ছেদ হ'বে না কোনো দিন—হ'বে না গৌরব বিন্দু হ্রাস।

কালিদাস





কণ্বের আশীর্ব্বাদ

স্বামী-গৃহে যাবে কন্যা আমার,
উদ্বেগে তাই ভরিছে বুক,
অন্তর ভরা বাষ্পের ভারে,
সকল বাক্য স্তব্ধ মূক।
আমি তপস্বী ঋষি বনবাসী—
আমারই যদি এমন হয়,
কন্যা-বিরহে কি ব্যথা না পায়
গৃহী লোক যারা গৃহেতে রয়!



শর্ম্মিষ্ঠার প্রেম ছিল যথা
যযাতির কাছে আদরণীয়,
স্বামীর আদর লভিয়ো তেমনি
কন্যা আমার, বৎসে প্রিয়!





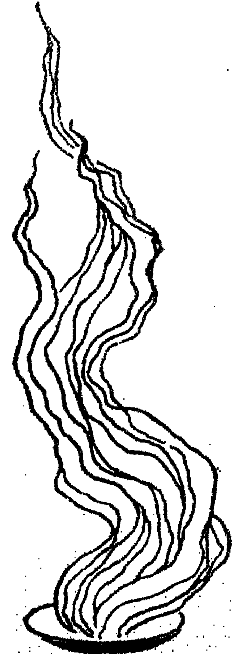
পুরুর মতন সব দিক-জয়ী,
সকল মর্ত্ত্যলোকের রাজা,
অঙ্কে তোমার শোভা পায় যেন
নয়নানন্দ পুত্র বাছা !



বেদির পার্শ্বে সাম্‌নে জ্বলিছে
বৎসে, ঐ যে আগুন শিখা,
সমিধের ভার দগ্ধ করিয়া
উজ্জ্বল যার বর্ণ লিখা,
হব্যে এবং গন্ধে তৃপ্ত—
সব পাপ হ'তে করিয়া ত্রাণ,
সেই যজ্ঞের অগ্নি তোমারে
উজ্জ্বল বিভা করুন দান !



বনের দেবতা, তপোবন তরু,
আগে তোমাদের না দিয়ে জল,
এক ফোঁটা বারি ভুলেও কখনো
গলায় নি যার কণ্ঠ তল ;





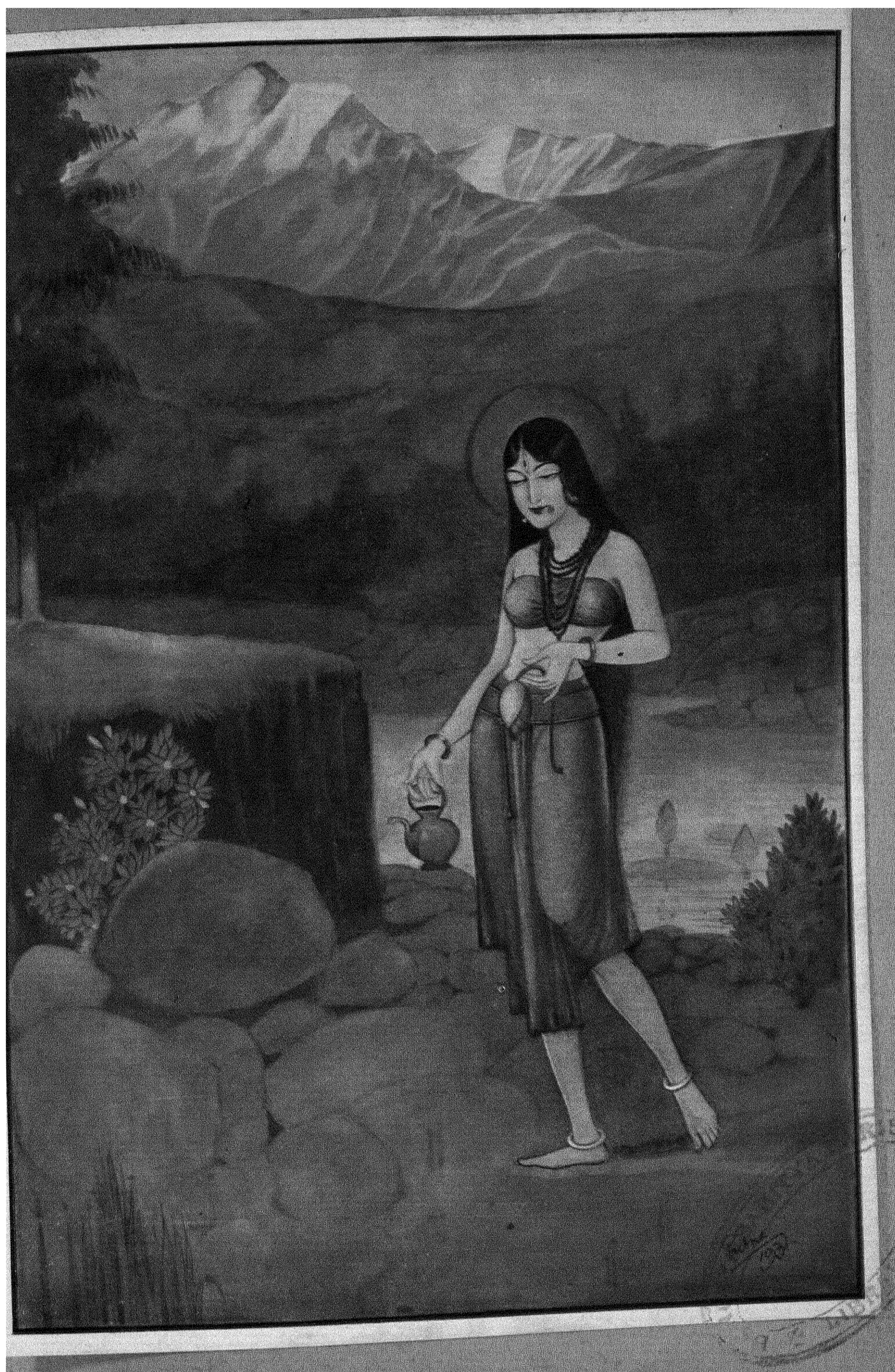
পুষ্প-ভূষায় ভালোবাসিয়াছে,
তবুও স্নেহের নিবিড়াবেশে,
একটিও দল করিয়া চয়ন
কখনো যে জন পড়েনি কেশে,
তোমাদের ফুলে সব চেয়ে বেশী
আনন্দ যার—আজিকে হায়,
সেই চলিয়াছে দয়িতের ঘরে,
খুশী মনে দাও বিদায় তায়।



শকুন্তলার গমনের পথ
সরোবর, করো রম্যতর,
কমলিনী তব নিবিড় আভায়
তাহারে স্নিগ্ধ মধুর করো।
ঢেকে দাও রূঢ় সূর্য্য কিরণে
ছায়া-সুমধুর তরুর দল,
অনুকূল বায়ু, পদ্ম-পরাগে
ছড়াও সে পথে সুমঙ্গল।

কালিদাস,







উমার তপস্যা

ফল্‌ত মুছে' কণ্ঠে দুলে' যে হার লেখা চন্দনের—
দুল্‌ত দু'টি স্তনের মাঝে হায়,
তারেই ছেড়ে পর্‌ল উমা উত্তরীয় বল্কলের—
উঁচু সে কুচ ঢাক্‌ল না তো তায়।

কেশের বিলাস ঘুচিয়ে দিয়ে জটার জালে ঘির্‌ল শির,
মুখের শোভা কম্‌ল না তো তার,
পদ্ম শুধু নয় রূপসী ভোম্‌রা যখন জমায় ভিড়—
শৈবালও তার বাড়ায় রূপের ভার।

তপের লাগি' পর্‌ল উমা মুঞ্জ তৃণের চন্দ্রহার—
কত কঠিন তাহার সে তিন ঘের,
ক্ষণে ক্ষণে অঙ্গখানি কাঁপনে তাই ভর্‌ল তার,
ঝর্‌ল আরো রক্ত জঘনের!





হাত ছিল যার ন্যস্ত আগে রক্তরাগে ভর্‌তে অধর,
পরাগ দিয়ে ঢাক্‌তে ছু'টি স্তন,
কুশাঙ্কুরের কাঁটার ঘায়ে আজ্‌কে ক্ষত তারই সে কর,
অক্ষমালার মধ্যে নিমগন।

কোমলতম শয়ন পরে কেশের ঝরা কুসুমে যার
পেলব তনু লভিত রূঢ়াঘাত—
বাহু-লতার উপাধানে শয়ন রচি' মৃত্তিকার
কাটায় সে আজ তাহার দিবারাত।

নিয়মে আজ দণ্ড যাপে—আবার সুখের ফির্‌বে দিন,
মনটা বুঝি তার কারণেও রোয়,
লতায় দেহ-লীলায় রাখে—খুঁজ্‌তে না হয়—চোখের চিন
তাই তা বন-মৃগীর চোখে থোয়।

নব-তরুর শিখর বাড়ে অতন্দ্রিত তাহার স্নেহে—
ঘটের স্তন করায় সুখে পান,
মায়ের মায়া ঘির্‌ল যখন কনিষ্ঠ সে কার্ত্তিকেয়ে—
গাছের স্নেহে তাও পড়ে নি টান।





বন-বীজের অঞ্জলিতে পাল্‌ল উমা বনের হরিণ,
এম্‌নিতর মান্‌ল তারা পোষ—
নিজের আঁখি তাদের চোখে কৌতুহলে করুলে লীন
চোখেই তারা ঝরাত সন্তোষ।

সিনান করি', বাকল পরি', আহুতি দিয়া যজ্ঞাগুনে
চল্‌ত তাহার স্তুতি-গীতির পাঠ,
কত মুনি আস্‌ত ছুটে'—স্তব্ধ হ'তো বাক্য শুনে',
ধর্ম্মে যে নাই ছোট-বড়র ঠাট!

হিংস্র পশু হিংসা তাহার ভুলে' গেল, বনের দ্রুম
অতিথিদের সেবায় দিল ফল,
কুটির তলে অনলেরো নয়নে না রইল ঘুম,
পবিত্রতায় ভর্‌ল বনতল।

বুঝ্‌তে উমা পার্‌ল তবু—এই যে কঠোর তপশ্চরণ
এতেও নাহি মিল্‌বে নিধি তার,
ভুলি' পেলব তনুর কথা তাই সে আবার কর্‌ল বরণ
আরো কঠিন দুঃখ তপস্যার!



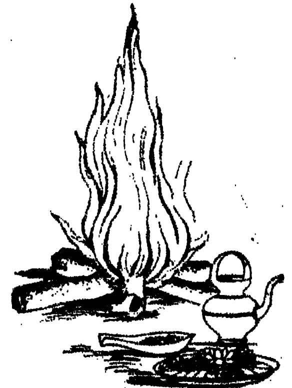


ঋষির রীতি সেই পালিছে ক্রীড়ায় যাহার কন্দুকের
শ্রমের জলে ভিজিয়া যেত কায় !
দেহের আভায় জ্বল্‌ছে তবু পদ্ম-বিভা সুবর্ণের,
কোমল বটে—সারও আছে তায় !

চারধারেতে আগুন জ্বালি' শুচিস্মিতা মধ্যখানে
উপেক্ষিয়া রবির কড়া তীর,
নয়ন ছু'টি নিমেষহারা রাখ্‌ত ফেলে রবির পানে—
কাটিয়ে দিত নিদাঘ দিনের ভিড় !

তখন সে তার আননখানি ছড়িয়ে পড়া আলোর রেখায়,
কমল ব'লে কেবল হ'তো ভুল,
যদিও হায় ঘির্‌তেছিল প্রতিদিনই কালির লেখায়
আয়ত তার আঁখির উপকূল।

অযাচিত মেঘের ধারা, রশ্মিরেখা চন্দ্রমার
বেসাদ ছিল তার সে পারণের,
গাছের সাথে, লতার সাথে ভেদ ছিল না কিছুই তার,
একই ধারা জীবন যাপনের।



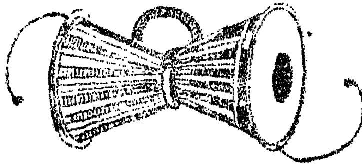


সূর্য্য এবং মাটির আগুন পোড়ায় যখন ধরার তনু
বর্ষা নামার সেই তো অবসর,
নবীন জলে শীতল হ'তো যখন ধরার দেহের অণু—
শীতল হ'তো তারও কলেবর।

চোখের পাতায় থম্‌কে থামি', অধর চুমি' মেঘের জল
স্তনের পরে পড়িয়া ভেঙ্গে
কটিতটের ভাঁজে পরায় পরাগ তারি রেণুর দল,
মিলায় শেষে নাভির

আরামহীনা শয়ন করে শিলার তলে
ঝঞ্ঝা-ধারায় চকিত চারি
তড়িৎলতার চক্ষু মেলি' রাত্রি দেখে কেবল তাই,
চেয়ে দেখে তপ সে বিপরীত!

সাম্নে দেখি' চক্রবাকের মিথুন অতি বিরহাতুর,
ডুক্‌রে ওঠে উমার মন-প্রাণ,
নিজের দেহে নীরবে সয় হিম ঋতুর আঘাত ক্রূর,
তুষার জলে ডুবায় তনুখান।





স্নিগ্ধ মধুর গন্ধ তাহার পেলব অধর পল্লবের,
শীতের ঘায়ে কাঁপন-লাগা কায়—
তুষার রাতের পদ্মবিহীন জলের বুকে ভর্‌ত ফের
পদ্মদলের রূপের নিশানায় ।

স্বয়ং-ঝরা শুষ্ক পাতা ভোজন করি' প্রাণ ধারণ—
তপস্যার তাহাই না কি সার,
তপস্বিনী—তাইতো শাস্ত্র-সরিদ্‌গণ
খু'জে' পেলেন নাম সে অপর্ণার ।

ঋষিগণও যে সাধনায় হারায় দিশ,
জয় খুঁজে' পায় পরাজয়ের লাজ,
মৃণাল সম সেই উমা হায় অহর্নিশ
তারই মাঝে ডুবিয়া আছে আজ !

কালিদাস







শিব-তাণ্ডব

পার্ব্বতী-গুণ-গান-কীর্ত্তনে—আঁখিজল
বর্ষিছে শূলপাণি শোক ভরে বিহ্বল।
লুণ্ঠিত কভু ভূমে, কখনো বা ধাবমান,
চক্রের মতো ঘোরে বিলোচন ভগবান।

দক্ষের তনয়ার ধ্যানে কভু মশ্‌গুল,
আশ্লেষে টানে কভু মৃত্যুর ছোঁয়া ফুল।
'পার্ব্বতী—পার্ব্বতী'—হুঙ্কারে শঙ্কর—
'রাখ্ মান, আয় বুকে,—দেখ্ হিয়া জর্জ্জর'

কান্তার সারা দেহে বুলায় সে হস্ত,
উন্মোচি' আভরণ ফের করে ন্যস্ত।
সম্বিত নাই তবু—তবু প্রিয়া নিশ্চল,
নেত্রে যে রুদ্রের সমুদ্র উচ্ছল।

অশ্রুর ঝর্ণায় উদ্ভূত নদী তার,
মৃত্যুর দোরে আজো গর্জ্জায় অনিবার।
শোকাকুল ব্যোমকেশ—বুকে পত্নীর শব—
উন্মাদ সম ধায়, জাগে পায় তাণ্ডব!

কালিকা পুরাণ





পঞ্চদশী

অলক যাহার আলোল হ'লো, দুলের দোলায় বিকল কান,
ধুয়ে' গেছে পত্রলেখায় দেহ-লতার স্বেদের বান,
নয়ন দু'টি লীলায় মাতি' শ্রমে যাহার অলস আজ,
কান্তা সেই কুশল করুন—বিধি-বিষ্ণুর নেইকো কাজ।



'অবোধ মেয়ে শিখ্‌লি নাকো প্রেমের কোনো নিয়ম ফের,
মান ক'রে রও, ধৈর্য্য ধরো, ঘুচাও সরলতার জের।'
শেষ না হ'তেই সখীর কথা প্রিয়া কহেন—'আস্তে বল্‌,
বঁধু আছেন মনের মাঝেই—শুন্‌লে চোখে ঝর্‌বে জল!'



শূন্য ঘরে শয়ান পতি, চোখে তাহার নিদের ভান,
নবোঢ়া সে প্রথম ব'সে রূপ-সুধা তার কর্‌লে পান,
একটি চুমো তার পরেতে—শিউরে ওঠে পতির বুক
লাজে মাথা নোয়ার বধূ—অম্‌নি চুমোয় ভর্‌ল মুখ!





বঁধুর পথে চোখ্‌টি রেখে মিলিয়ে গেল দীর্ঘদিন,
অন্ধকারে পথিক-প্রিয়া ফির্‌ল ঘরে—ব্যথায় লীন।
ঘরে ফিরে'ও একটি পা সে দাওয়ায় রেখে আবার চায়,
হঠাৎ যদি বঁধুর ছায়া পথের বাঁকে দেখাই যায়!



মুখের পানে হান্‌ল দিঠি—নামিয়ে মুখ চাইনু পায়,
মঞ্জু বাণীর আরম্ভেতেই ঢেকে নিলাম কর্ণ হায়,
হাতে ঢেকে দিলাম গালের পুলক-ভরা স্বেদের জল,
কাঁচুলীটা কাঁপ্‌ছে এবার—কি করি সই, উপায় বল্‌!



বসন ধ'রে টান্‌ল না সে, হাত দিল না দোরের পর,
পদতলেও পড়্‌ল নাকো, তুল্‌ল না সে মানার স্বর।
তন্বী শুধু চোখের কোণায় আন্‌ল টেনে সিন্ধু নদ,
রোধ ক'রে তাই রইল খাড়া প্রিয়তমের গমন পথ!





‘নিশীথ রাতের আঁধার এ যে—তন্বী, ওরে কোথায় যাস্ ?’
‘যাচ্ছি যেথায় রভস-ব্যাকুল বন্ধু আমার করেন বাস।’
‘কুটিল ও পথ, একলা তুমি—চিত্তে তোমার ভয় কি নাই ?’
‘শঙ্কা কিসের ? সঙ্গে আছেন বাণ হাতে কাম দেব্‌তা ভাই !’

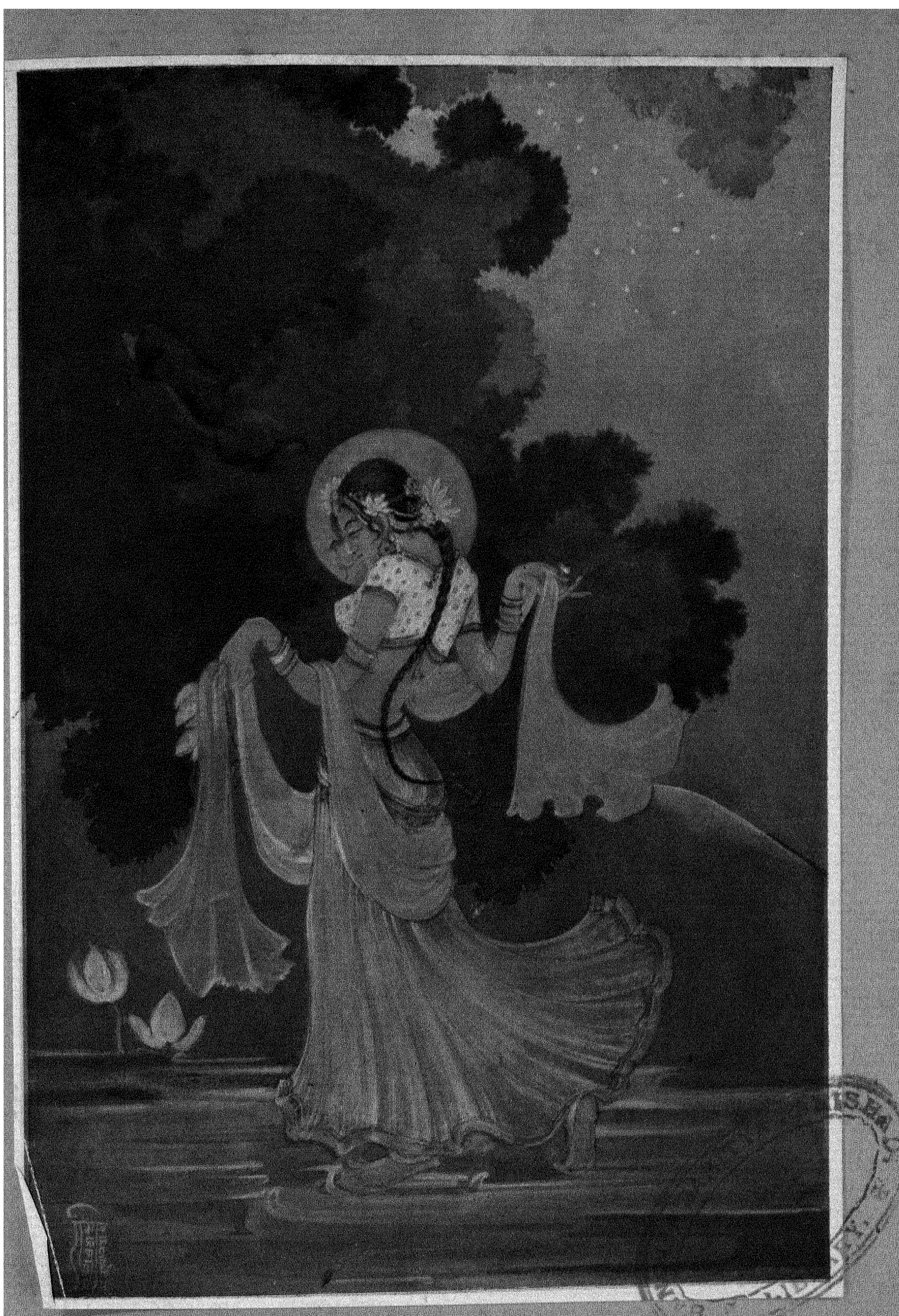


দৃষ্টি দিয়ে বরণ-মালা গড়্‌ল তাহার পদ্ম-চোখ,
হাসির ঝোরা ঝরিয়ে দিল কুন্দ-যূথীর পুষ্পালোক,
স্তনের কলস স্বেদের ভারে নিজের তনুই ভর্‌ল তার,
গৃহাগত প্রিয়ের লাগি’ তন্বী রচে অর্ঘ্য-ভার।



এক বিছানায় বাক্য-বিহীন—বিমুখ শুয়ে’ পরস্পর,
মিলন লাগি’ উতল হিয়া, তাও ছাড়ে না কেউ গুমর।
একটু পরেই উচ্চ শির—আড়্ চোখেতে চাওয়ার চোট,
চোখে চোখে মিলন হ’তেই ঠোঁটের সাথেও মিল্‌ল ঠোঁট !







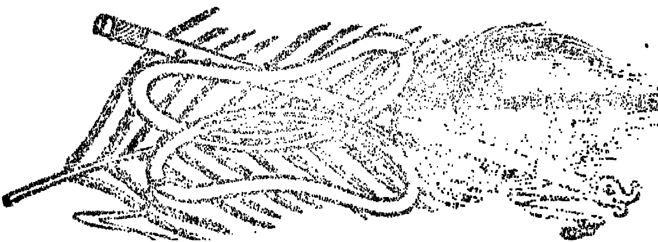
অধরটারে কামড়ে দাঁতে, দুলায়ে দু'টি কোমল কর,
'ছুঁয়ো না' কয় যখন প্রিয়া, চোখ দু'টোতে ঝরায় ঝড়,
জোর ক'রে হায় তখন তারে যে খায় চুমো সেই তো পায়
সুধার সোয়াদ,—দেব্‌তারা সব বৃথাই মথে সাগর হায়!



গুরু উরু তুল্‌ছে গ'ড়ে কদলীর ঐ তোরণ-তল,
জোড়া কলস—তাও ভরেছে রূপের নিঝর স্তন যুগল।
সিংহাসনের মঞ্চ রচে নিখুঁৎ দেহের মধ্য দেশ,
মদন রাজার অভিষেকের এই তো জানি যোগ্য বেশ!



কপোল তলের পত্রলেখা—হাত লুটে তার রঙ্‌-এর ছোপ্‌,
অধর-পুটের সুধার ধারা নিশাস পিয়ে কর্‌ল লোপ,
স্তনের তটে কাঁপায় মুহুঃ বিগলিত বাষ্প-ঢেউ—
মানই তোমার কান্ত প্রিয়া, আমি তোমার নইকো কেউ।





খেলার ছলে কি খেয়ালে হঠাৎ ব'লেছিলাম—'যাও',
জোর ক'রে তাই শয্যা ছেড়ে নিঠুর বঁধু আজ উধাও।
হায় যে পাষাণ এম্‌নি ক'রে ভালোবাসার ভাঙ্‌ল জের,
তবু হিয়া চাইছে তারেই—এম্‌নি আমার গ্রহের ফের!

মিনত্‌ ক'রে চরণ ধ'রেও সাম্‌লাতে সে নার্‌ল টাল,
বরং আরো স্বৈরাচারী ব'লেই প্রিয়া ঝাড়্‌ল ঝাল।
নিশাস ছাড়ি' কান্ত ক্ষোভে ছাড়্‌ল ঘর—তার পরেই
পড়্‌ল বধূ সখীর বুকে—সজল আঁখি—সংজ্ঞা নেই!



জঘনে তোর কাঞ্চি হাঁকে, গলায় মালা জ্বল্‌ছে ঠিক,
পা'র পরে ঐ নূপুর দু'টি ঝাঁঝিয়ে চলে দিগ্বিদিক।
ঢোল দিয়ে আজ প্রিয়ার পথে যাত্রা যদি সুরুই হয়,
চকিত্‌ চোখে চাইছ কেন?—আবার তোমার কিসের ভয়!

অমরু





সীতা

চাঁদের কিরণে ঘেমে উঠে যথা
চন্দ্রকান্ত মণির হিয়া,
শ্রমের তাড়না স্বেদে ভরিয়াছে
লীলায়িত বাহু তোমারো প্রিয়া।
মালার মতন ঐ বাহু দু'টি
জড়াও আমার কণ্ঠ পর,
ক্লান্ত আমার হৃদয়ে জাগুক
নূতন জীবন স্নিগ্ধতর।

তোমার ভুজের বন্ধনে সখি,
কিছুই বুঝি নে কি যাদু রাজে,
কিছুই বুঝি নে—জেগে রয়েছি কি,
কিম্বা রয়েছি নিদ্রা মাঝে।

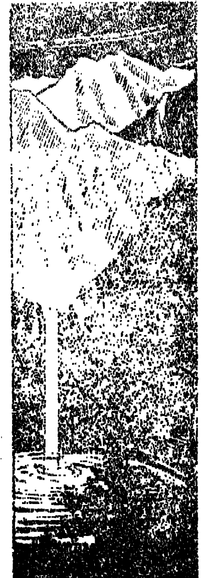




বিষ কি মদিরা কিসের ধারা এ ?—
মন হ'য়ে উঠে মাতাল প্রায়,
ক্ষণে জ্ঞান হয়, ক্ষণেকে হারাই,
স্পর্শ তোমার এমনি হায় !

বাণী তব সখি, বিকশিত করে
জীবন-কুসুম শুষ্ক ম্লান,
সব ইন্দ্রিয় মোহে ম'রে যায়,
আনন্দ বুকে জাগায় বান।
কর্ণে তাহারা সুধা ঢেলে যায়,
মুছে' নিয়ে যায় সকল গ্লানি,
যে ওষধি প্রিয়ে, মৃতেরে বাঁচায়
সঞ্জীবনী সে তোমার বাণী।

আমার এ বাহু স্নিগ্ধ সবল—
এদের আলিঙ্গনের পরে,
মাথাটিরে রাখো প্রেয়সী তোমার—
মাথা রাখো তব লীলার ভরে।



সেই বিবাহের পর হ'তে এরা
ঘরে আর বনে সকল ঠাঁই,
উপাধান তব রচিয়াছে সখি,
সে কথা কি আজ স্মরণ নাই !

ঘরে তুমি প্রিয়া, লক্ষ্মী আমার,
নয়নে অমৃত কাজল আর,
তোমার সরস অঙ্গ-পরশ
যেন চন্দন-গন্ধ-ভার ।
দু'টি বাহু তব কণ্ঠে আমার
এলায়িত দু'টি মুক্তা-মালা,
প্রেয়সী, তোমার আর সবই প্রিয়,
অসহ কেবল বিরহ জ্বালা ।

ভবভূতি





বসন্তোৎসব

আবীর গুঁড়া ছড়িয়ে গেছে,
ঊষার ফাগে ভর্‌ল ধরা,
কুঙ্কুমেরি চূর্ণ লেগে
হ'লো সে পীত বর্ণে গড়া।

সোনার আভরণের আভায়
পাপ্‌ড়ি ফুলের ফুট্‌ল রে,
কুবের রাজার রত্নশালা—
তারও গুমর টুট্‌ল রে।

জন-গণের বসনগুলো—
তাতেও পীতের নাম্‌ল ঢল,
বসন্তেরি উৎসবেতে
রূপ-সমুদ্র সমুজ্জ্বল।



উৎস রঙের উথ্‌লিয়েছে
ঝর্‌ছে অঝোর পিচ্‌কারী,
কর্দ্দমেতে পিছ্‌লিয়েছে
গৃহাঙ্গনের চা'রধারি।

বিভল বধূর অলক হ'তে
সিন্দুর রেখা গলিয়েরে,
পায়ে প'ড়ে ছড়িয়ে গেছে—
গেছে তুলি বুলিয়েরে।



আবীরের ঐ ধূলোর জালে
আঁধার হ'লো দিগ্বিদিক
মণির ভূষা তড়িৎ লেখা
সেই আঁধারে আঁক্‌ছে ঠিক।

জল-ধারার যন্ত্র হের
সাপের ফণা হান্‌ছে গো
পাতালের নাগ্‌-লোকের স্মৃতি
ধরায় ব'য়ে আন্‌ছে ও।



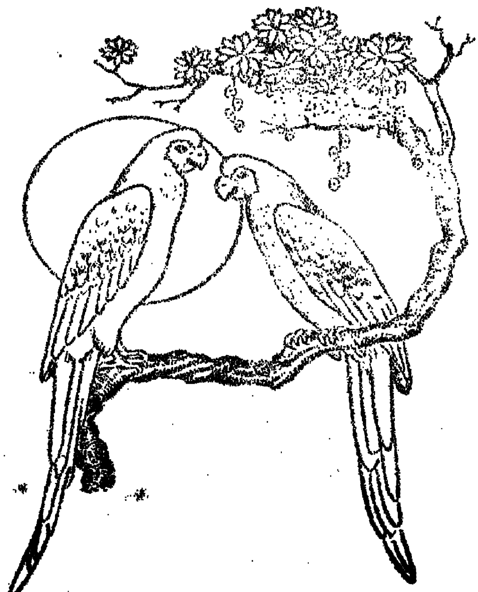


মানিনীদের মানের দোরে
খিল্ খুলেছে আচম্‌কায়,
আমের বোলের কানে কানে
দখিন বায়ু গুন্‌গুনায়।

ব্যাকুল হ'লো বকুল বীথি—
বল্লভেরি পথ্-চেয়ে,
বন-পথের ফাঁকে ফাঁকে
বেরিয়ে এলো লাখ্ মেয়ে।

সুমুখ হ'তে ফাগুন আজি
মোহের ফাঁদে মন টানে,
পিছন হ'তে বুকে মদন
তার কুসুমের বাণ হানে।

শ্রীহর্ষদেব





দেহ-পদ্ম

সূর্য্যের কিরণের
আঁচ্ যেই লাগ্‌ল,
সারা মুখ পদ্মের
দীপ্তিতে ঢাক্‌ল।
দন্তের পংক্তির হাস্যের ছন্দে
বাতাসেরো তনু-তটে
হিল্লোল আঁক্‌ল।
সবই তার পদ্মের—অধরের গন্ধে
তাই এই মধুলোভী
ভোম্‌রাও জাগ্‌ল!

শ্রীহর্ষদেব





অতনুর আফ্‌শোষ

বকুলের পাদমূল তরুণীর মুখ-মদে
গিয়াছে ভরি',
তাই তার মুকুলের বৃষ্টিতে বুঝি মধু
পড়িছে ঝরি'।

তরুণীর মুখ-শশী পান করি' মদিরায়
রাঙিয়া উঠে,
সে রঙের রেখা নিয়ে রাঙা চম্পকদল
উঠেছে ফুটে'।

তরুণীর পদাঘাত অশোকের বনে আজ
নূপুর হানে,
নিয়ে তারি ঝঙ্কার ভীরু ভ্রমরের দল
মেতেছে গানে।





মন্মথ পূজে প্রিয়া স্নান শেষে পীত বাস
জড়ায়ে গায়,
ঝ'রে পড়ে রূপ তার নব কিশলয়ে ঢাকা
লতার প্রায়।

অশোকের গুচ্ছরে মৃদু পরশিয়া চলে
হস্ত তার,
মনে হয় আরেকটি পল্লব তরু হ'তে
হয়েছে বা'র।

অতনু সে তনুহীন—তাই তার দুঃখেরো
নাহিক শেষ,
হস্তের স্পর্শ সে পেলো না কি আফ্‌শোষ,
হায় কি ক্লেশ!

শ্রীহর্ষদেব



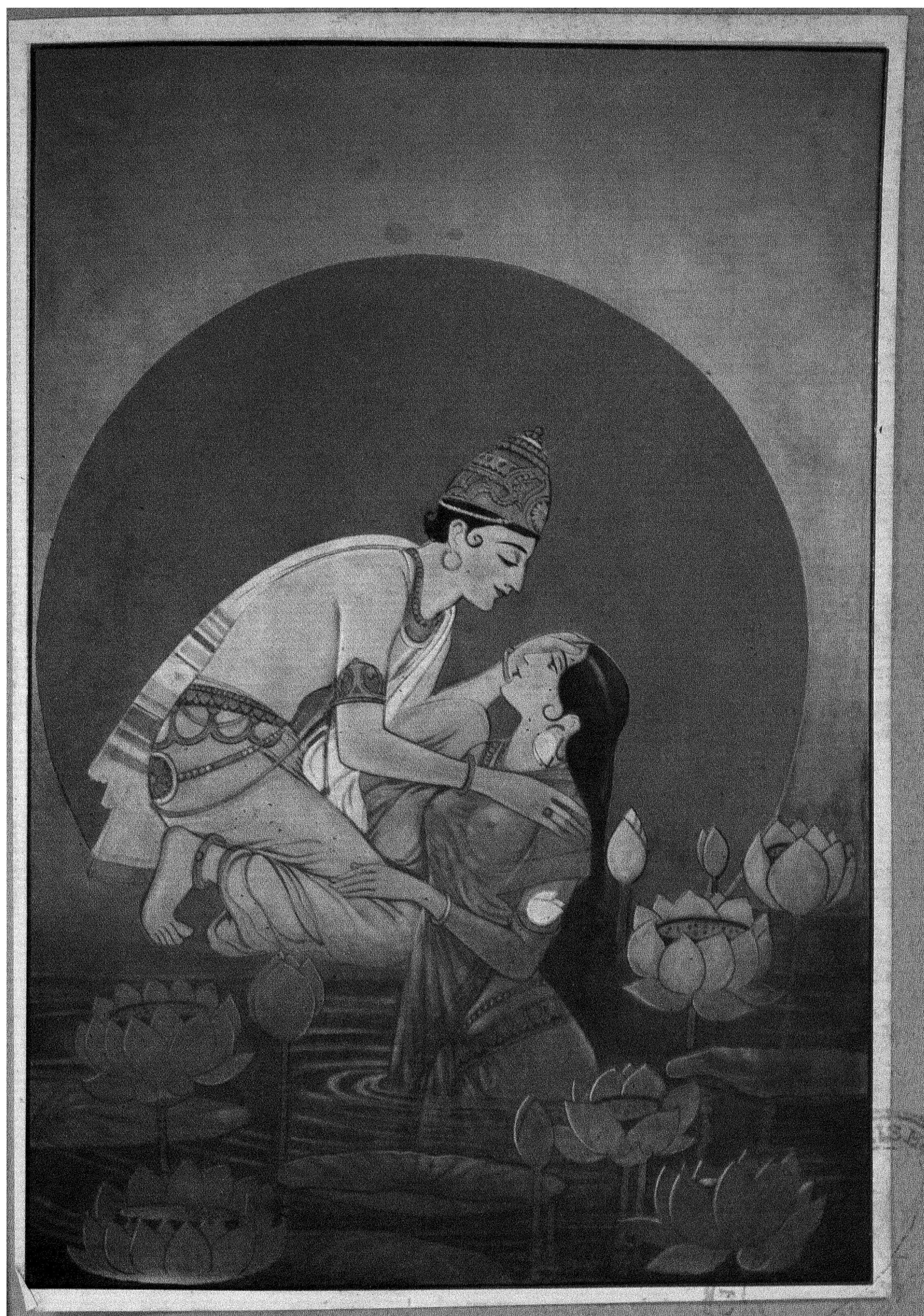


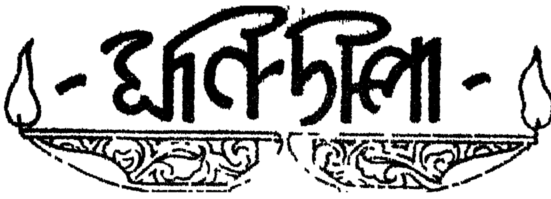
তন্বীর বিপদ

তনু-তট তব তন্বী, স্তনের ভারেই জের্‌বার,
কে চাপালে ঐ মাল্য বক্ষের পরে ফের তার ?
গুরু নিতম্ব উচ্ছল, তাহারে টানাই দায় হায়,
মেখলার ভারি পর্ব্বৎ চাপায় কি কেউ তার গায় ?
চারু চরণের ছন্দ উরুর চাপেই হিম্‌ সিম্‌,
কে তায় জাগায় ফের্‌ বল্‌ নূপুরের ঐ রিম্‌ ঝিম্‌ ?
প্রতি অঙ্গই হায় যার ভূষণ—ধরার গৌরব,
আভরণ দিয়ে তার গায় কেন দাও দুখ্‌ এই সব !

শ্রীহর্ষদেব







সূর্য্যের আশ্বাস

সমস্ত ভুবন ভ্রমি', সাঙ্গ করি' দীর্ঘ অভিযান,
অস্ত-শিখরের শিরে দাঁড়াইল তপনের রথ,
ক্ষয়-ক্ষীণ এক চাকা—এক চক্র স্থির স্থাণুবৎ;
ঘনায় চিন্তার মেঘ—পরিম্লান সূর্য্যের নয়ান।
অকস্মাৎ চোখে পড়ে ধরণীর সীমান্তে শয়ান
দিক্-অয়শ্চক্র খানি। আলোড়িয়া অস্তের পর্ব্বৎ
সূর্য্যের সহস্র রশ্মি গ'ড়ে তোলে সুন্দর বৃহৎ
রথচক্র; সন্ধ্যা-বুকে তারি স্বর্ণ-দণ্ড দীপ্যমান।
দীপ্তি জাগে আনন্দের। রাখি' কর পদ্মিনীর শিরে
কহে সূর্য্য—দেখো প্রিয়ে, নবতর আমার স্যন্দন;
প্রভাতের পুষ্প-তনু আবার আসিবে যবে ফিরে'
আঁধারে র'বে না বিশ্ব—তুমিও র'বে না অচেতন।
আজি তবে নিদ্রা যাও, ঐ হের তন্দ্রা নামে ধীরে।
তোমারে জাগাবে কাল এ ওষ্ঠের প্রথম চুম্বন।

শ্রীহর্ষদেব

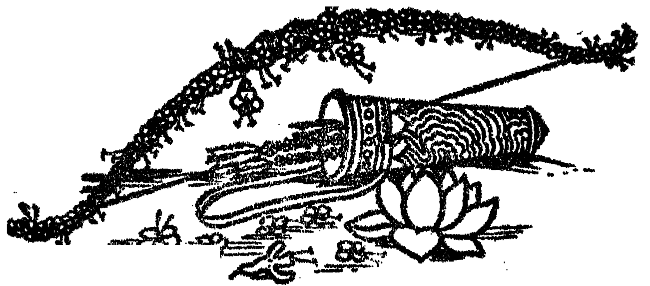




নবোঢ়া

আননের পানে চেয়েছি কি তার,
নয়নের দিঠি যায় নেমে,
কথাটি কহিতে যেই যাই কাছে,
বাণীর বীণাটি যায় থেমে।
নিরালায় চাহি শয্যায়—সে যে
হয় না সখীর কাছ ছাড়া,
জোর ক'রে যদি বুকে টানি তারে,
সারা দেহ কেঁপে হয় সারা।
সখীরা সরমে ঘর ছাড়ি' যায়,
দূরে যেতে চায় সেও সরি'!
সবই বিপরীত নবোঢ়া প্রিয়ার,
তবু নিল মন সেই হরি'।

শ্রীহর্ষদেব





স্বর্গ না নরক

হেথায় ওঠে বীণার তারে
মিষ্ট সুরের ঝনন্ ঝন্,
উচ্চ সুরে কান্না ঝরে
তারই পাশে হোথায় ফের,
হেথায় সভা-পণ্ডিতেরা
শাস্ত্র কথার তত্ত্ব ক'ন,
হোথায় চলে পাঁড় মাতালের
ঝগ্‌ড়া-ঝাটির নিত্য জের।

হেথায় হাসির থোকার মতো
তরুণীদের দীপ্তি ভায়,
হোথায় ঝরা শুষ্ক কুসুম—
জীর্ণা নারী জাগায় শোক।
আলো এবং অন্ধকারে
পাই নে আমি কিছুই ঠায়,
দুনিয়াটা নরক—না এ
আগা গোড়াই স্বর্গলোক!

ভর্তৃহরি





মৌক্তিক

নীল সরোজে নয়ন গড়া,
          মুখ গড়েছে শ্বেত কমল,
পল্লবেরি রক্ত অধর,
          দন্তে ঝলে কুন্দ দল।
তন্বী, তোমার তনু-লতা
          চাঁপায় গ'ড়ে উঠ্‌ল যে,
কেবল তোর ঐ চিত্তটাকে
          পাষাণ দিয়ে গড়্‌ল কে ?



তরল তব দীর্ঘ চোখের
          দৃষ্টি হানো ফের প্রিয়ে,
আঁখি যারে বিঁধ্‌ল বাণে
          আঁখি তারেই যাক্‌ জী'য়ে।
নয় এ অসম্ভবের কিছু,
          চির দিনের রীত্‌ যে এই—
যে গরলে মরণ আনে,
          বাঁচে মানুষ সেই বিষেই।





নিঠুর বঁধু—তাহার কাছে
দুখের কথা কো'স্ নে মোর,
এলো না যে তার ওপরেও
রূঢ় কথায় দিস্ নে জোর।
কুশল নিয়ো, তাহার সাথে
জেনে এসো এইটি আর
ফুট্‌ছে মুকুল দখিন বায়ে,
খোঁজ্ কিছু সে রাখ্‌ছে তার!



বিরহে চাঁদ দেয় যে ব্যথা,
ছোঁয় না সে হায় তাই মুকুর,
কোকিল-কূজন শোনার ভয়ে
রুদ্ধ রাখে নিজের সুর।
বাণের জ্বালা জ্বালায় ব'লে
শুন্‌তে নারে কামের নাম,
কামের মতোই তুমি—তবু
তোমার পরে নয় সে বাম।





কামের তূণে ফুলের শায়ক—
আঘাত কেন লাগ্‌বে তায় ?
অঙ্গ-বিহীন সূক্ষ্ম হৃদয়—
বাণ বিধানো তায় কি যায় ?
প্রশ্ন শুনি, যুক্তি বুঝি,
কিন্তু তবু ঐ মদন,
মন যে মথে মিথ্যা নহে—
সাক্ষী তার এই ক্লিষ্ট মন।

*

বিম্বফলে গড়্‌তে ভুলে'
গড়্‌ল বিধি তার অধর,
নীলোৎপলে গড়্‌তে গিয়ে
গড়্‌ল নয়ন ইন্দীবর,
মদন রাজার ভুলের ভূমি
তার দেহের যে সকল ঠাঁই—
বিধাতারি ভুল হয় যদি
আমরা তবে কোথায় যাই !

উদ্ভট





ছ্যাঁচা হলুদ—তারই মতো
রূপসী, তোর অঙ্গ ঐ,
বিরহ তাই পাণ্ডু ক'রে
পাংশু ক'রে তুল্‌ল সই।
সোনার সাথে মিশ্‌ল রূপা—
বিরহ তার রঙ্-শালায়,
আঁক্‌ল একি রূপের ছবি ?
চোখ্ ফিরানো আজ যে দায় !

রাজশেখর



রূপের লেখা তার যে জাগে
আমার চোখের মাঝখানে,
স্পর্শ দেহে লেগেই আছে,
জাগ্‌ছে গানের রেশ কানে,
হৃদয় তাহার নিত্য আছে
এই হৃদয়ের মধ্যে লীন,
ভাগ্য তবে কর্‌ল আমায়
কোন্ সে পরম বিত্তহীন !

হাল



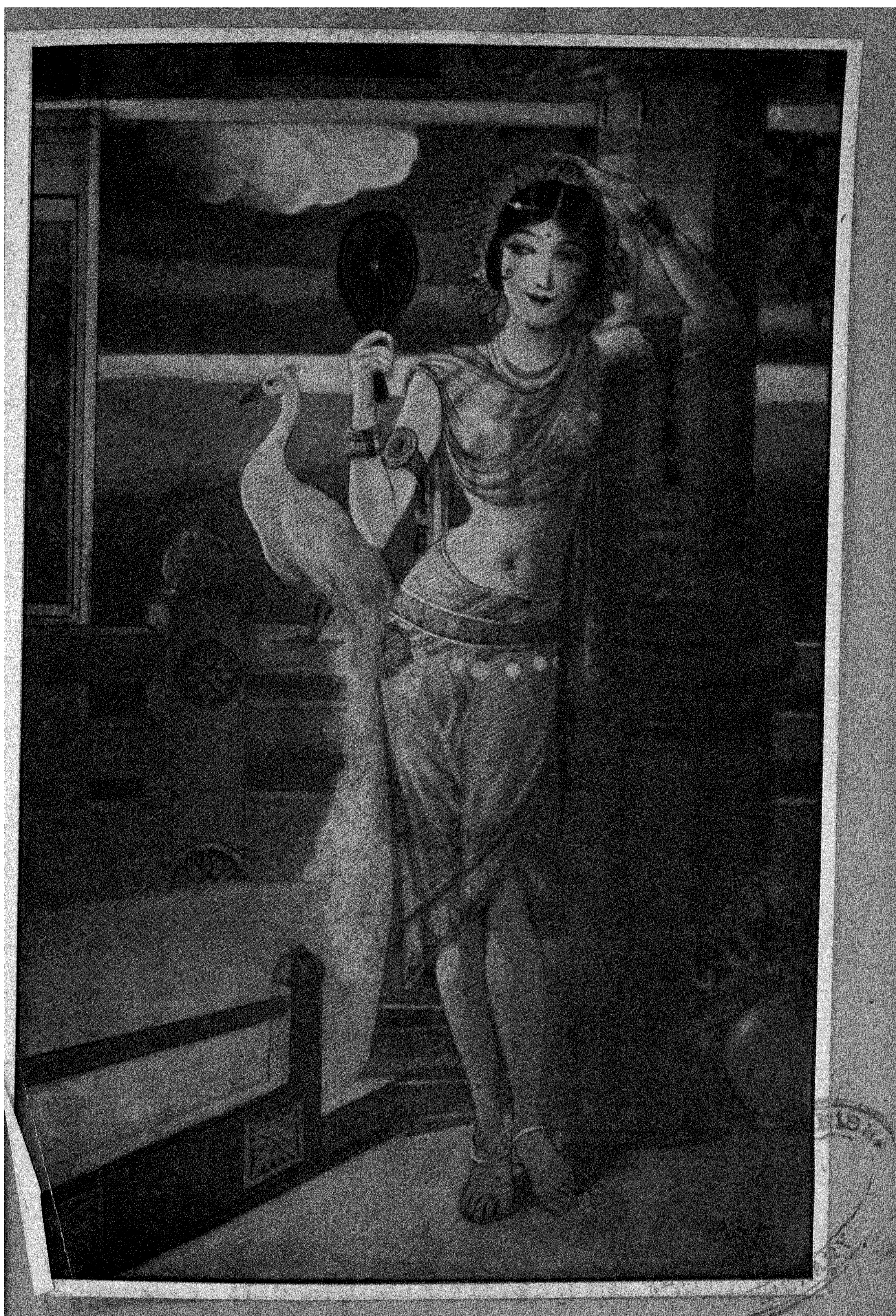


বিরহীর হৃদয়

"পরাণের বঁধু, তোমারে আমার
জানাই মনের কামনা ভার,—
যে দেশে রয়েছ সেই খানে থাকো,
এখানে ফিরিয়া এসো না আর।
সবে কহে—চাঁদ অমৃত ঝরায়,
এ দেশ এমনি ভীষণ ঠাঁই,
জ্যোৎস্নাও দহে তনু-মন-প্রাণ,
এতটুকু তারো মমতা নাই!"

"মিছে আশঙ্কা ব্যাকুলিছে আজ
চিত্ত তোমার হে প্রিয়া মোর,
জ্যোৎস্না সে নয় যার আঁচে হায়
বিকল ও তনু-পুষ্প তোর।
বিরহ-তপ্ত হৃদয় আমার—
তারি মাঝে তুমি রয়েছ জাগি,'
তাই তো জ্বালায় জ্বলিতেছে দেহ,
চাঁদে কেন করো দোষের ভাগী!"



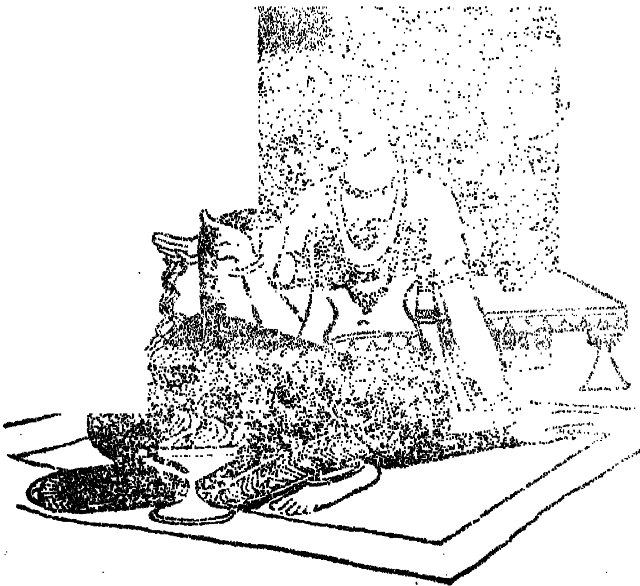


অনর্থক

আঁখি তব হরিয়াছে হরিণের স্পর্দ্ধা,
আঁকিও না আর তায় কজ্জ্বল-পঙ্কে,
বাণই যদি ভেদ করে বক্ষের পর্দ্দা,
কেন তায় মাখা ফের গরল কলঙ্কে !

অন্তরে অতনু সে বাণ যার হান্‌ছে
নেই তার চন্দন লেপনের অর্থ,
কুন্তের চুল্লী যে ইন্ধনে জ্বল্‌ছে
পঙ্ক-প্রলেপ তায় নিঃশেষে ব্যর্থ !

অজ্ঞাত





কুড়ানো ফুল

বিরহের জ্বালা বুকে নিয়ে—ঘুমে
জড়ায় যাহার চোখ,
সুখী সেই সখি, তার কাছে নহে
ব্যর্থ স্বপ্নলোক।
স্বপনে সে পায় বঁধুয়ার দেখা,
আমার বিপদ এই—
বিরহ দিনের সুরু থেকে আজো
নয়নে নিদ্রা নেই !



বৃথা তোমাদের চেষ্টা বন্ধু,
মিথ্যা প্রয়াস হায়,
ভালোবাসা—তার দীপ্ত আলোক—
তাও নাকি ঢাকা যায় ?
মৃগনাভি—তারে যেমনি করিয়া
বসনাঞ্চলে ঢাকো,
গন্ধ তাহার সাড়া দিয়ে যায়,
গোপন সে রহে নাকো।





কামিনীর দেহ—দেহ সে তো নয়,
ঘন ঘোর কান্তার,
কুচ-যুগ সম অতি দুর্গম
গিরি আছে বুকে তার।
বাঁকে বাঁকে তার আছে তস্কর—
মন্মথ মনোচোর,
ওরে ও পান্থ, তার মাঝখানে
হারাস্ নে পথ তোর !



করীর কুম্ভ—কেহ কহে—ঐ
ঘট সম কুচ দু'টি,
কেহ কহে—রূপ-সায়রে রয়েছে
স্বর্ণ-পদ্ম ফুটি'।
আমি কহি—না—না, মদনের রাজা
জয় করি' চরাচর,
দুন্দুভি দু'টি উপুড় করিয়া
রেখে গেছে হিয়া পর !

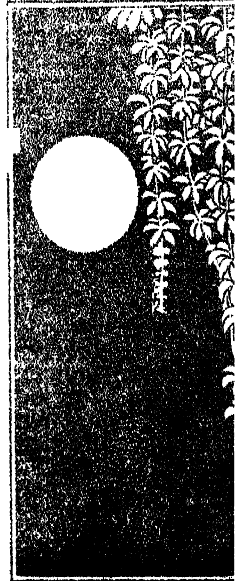




চোখের সাম্‌নে তুমি নাই তাই
নয়নে অশ্রু ঝরে,
শীর্ণ এ তনু তোমারে না পেয়ে
আলিঙ্গনের পরে।
তোমার মধুর বাক্য শোনে না—
কর্ণ তাই তো ক্ষীণ,
মন তো তোমারি সঙ্গে রয়েছে,
তবু কেন সে মলিন!

❋

দগ্ধ যে করে কলঙ্কী চাঁদ,
বিস্ময় নাহি মানি,
ভুজঙ্গ সহ রহে চন্দন,
তাই সে জ্বালায়—জানি।
অতনুর দাহ—তারো হেতু বুঝি—
সে যে বিদগ্ধ ওরে,
বিশ্বের আয়ু তুমি তো মলয়,
তুমিও দহিছ মোরে!





মহেশের ভালে চন্দ্র রয়েছে—
জড়োয়া জ্যোৎস্না গা'য়,
নিখিল ভাবিছে—কলঙ্কীটার
এ কি গৌরব হায় !
তারা তো জানে না শিবের ভালেই
আঁখিরো আগুন আছে,
অন্তর্গূঢ় কি যে জ্বালা তার
চাঁদ তাও জানিয়াছে !

※

শুষ্ক নদীর কূল ভ'রে ওঠে
তরুণ বর্ষা-জলে,
বসন্ত ভরে শূন্য বিটপী
নব মঞ্জরী দলে।
চাঁদের কলাও ফের ফিরে' আসে,
পূর্ণিমা ফেরে যদি,
বারেক শুকালে আর নাহি ভরে
শুধু যৌবন-নদী !

কথা-সরিৎ-সাগর





প্রিয়া

সকলের সেরা দেখার জিনিষ
কি আছে তুনিয়া মাঝে ?
প্রেয়সীর মুখ যাতে উৎসুক
হরিণীর আঁখি রাজে।

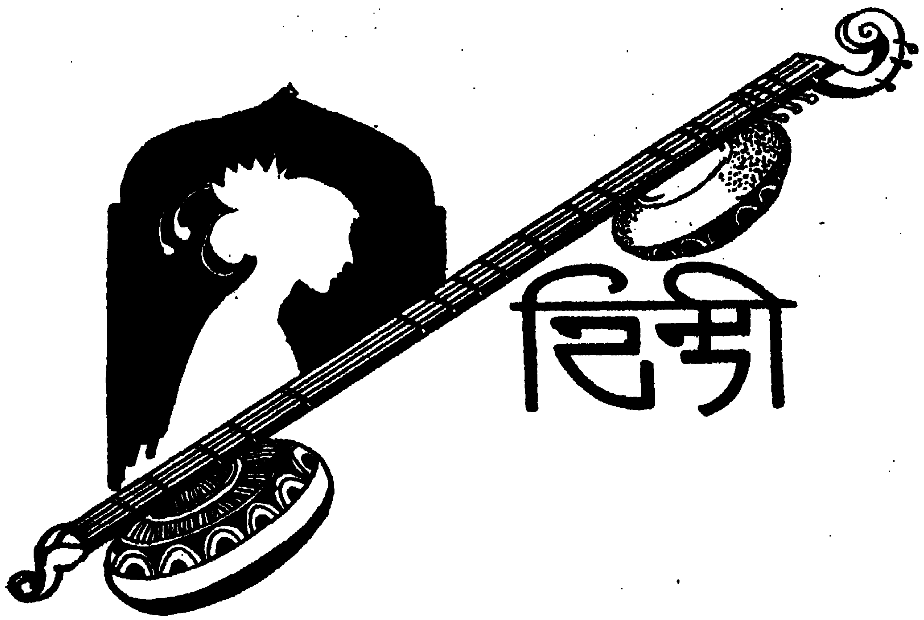
কোন্ সেই ঘ্রাণ মাতায়,যা প্রাণ ?
ঘন নিঃশ্বাস তার,
শ্রবণের ক্ষুধা মিটায় কি সুধা ?
তার সুর-ঝঙ্কার।

মধু হ'তে গাঢ় মধুর কি আরো ?
প্রিয়ার ঠোঁঠের ক্ষীর,
জিনে চন্দন কার পরশন ?
পরশ সে প্রেয়সীর।

কাহার ধ্যানের স্বপনের জের
সুখে মন করে ভোর ?
সন্ধানী কয় সে যে নিশ্চয়
রূপসী প্রেয়সী মোর।

অজ্ঞাত









অসম্বৃতা

চিত-নন্দন—তারি সম্মুখে নাচ্‌ব,
নেচে দেবো আনন্দ—প্রেম আরো যাচ্‌ব।
        বাঁধ্‌ব গো পদতলে
                পীরিতির ঘুঙ্‌ঘুর,
উজ্জ্বল বসনেতে বক্ষেরে ঢাক্‌ব।
        লোক-লাজ কুল-মান—
                সব ভেঙে হোক্ চুর,
কোনো খানে এতটুকু বাধা নাহি রাখ্‌ব।
        বন্ধুর কীর্ত্তনে
                মীরা র'বে ভরপূর,
পালঙ্ক পরে তারি সারা নিশি জাগ্‌ব।

মীরাবাঈ





মীরার কামনা

আমায় করো নফর তোমার,
আমায় রাখো চাকর ক'রে,
চাকর হ'য়ে বন্ধু তোমার
কুঞ্জ-ভবন তুল্‌ব গ'ড়ে।
নিত্য তোমার দরশ পাবো,
লীলার সুরে ভর্‌ব গলি,
বৃন্দাবনের পথে পথে
ছড়িয়ে যাবো গানের কলি।
চাকর হবো—দরশ পাবো,
পাবো বেতন—তোমার স্মরণ,
ভক্তি-ভাবের জাগীর পাবো—
তাই পাবো যা পরম রতন।



গড়্‌ব কানন শ্যামল ঘন,
ঝর্‌ণা-ঝোরা ঝর্‌বে তায়,
কুসুমী রঙের শাড়ীখানি,
জড়িয়ে নেবো সকল গায়।
তোমার সাথে শ্যামল বঁধু,
মিল্‌ব সেথায় বনের ছায়।

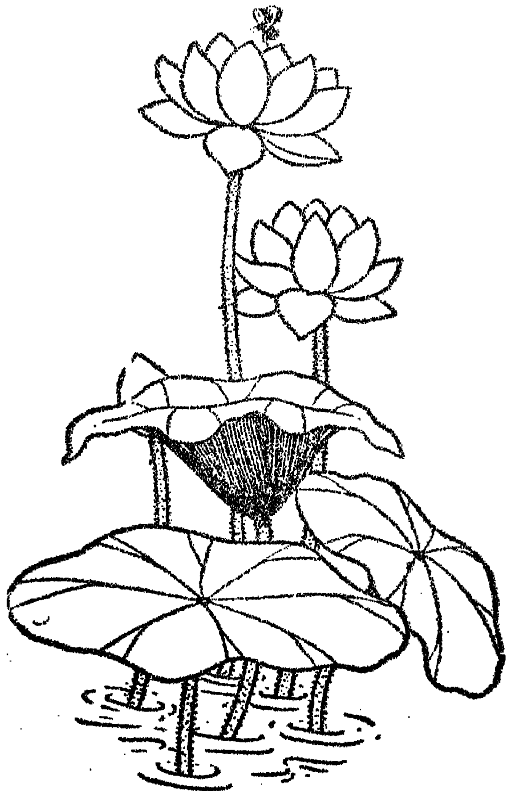
যোগী আসেন বৃন্দাবনে,
তোমার লাগি' করেন যোগ,
সন্ন্যাসীরা তপস্যাতে
ত্বঃখ শত করেন ভোগ।
ভজন লাগি' আসেন সাধু,
তোমার দ্বারে নিত্য ভিড়,
মীরার বঁধু বিকার-বিহীন,
জেগে আছেন থির গভীর





হো'স্ নে অধীর মীরার হৃদয়,
হোক্ না আঁধার নিবিড় ঘোর,
আধেক রাতেই দিবেন দেখা
গোপনচারী বন্ধু তোর।
ঘন নিবিড় নদীর তীরে
বাঁধ্‌বে হাতে মিলন ডোর।

মীরাবাঈ





প্রতীক্ষা

বঁধু নাহি পাশে নিদ্ নাহি আসে নয়নে,
বিরহী হৃদয় দহিছে প্রণয় দহনে,
দীপ নাহি জ্বলে মন্দির-তলে উলসি'—
চারি ধারে তার ঘেরা আঁধিয়ার গহনে।

শীতল শয়ান—সেও হানে বাণ আজি যে,
বিধুরা ধরণী গহিন রজনী জাগিছে,
কবে প্রিয়তম আসিবে এ মম ভবনে—
আমি আছি তার পথে অনিবার চাহি যে।

খুলিয়াছে দিল পাপিয়া কোকিল দাদুরী,
পায়ে ময়ূরের ঝরে নৃত্যের চাতুরী।
ঘোর ঘন ঘটা—আজি তারি জটা গগনে—
বিজলীর গা'য় ভয়ে ঘুচে' যায় মাধুরী।



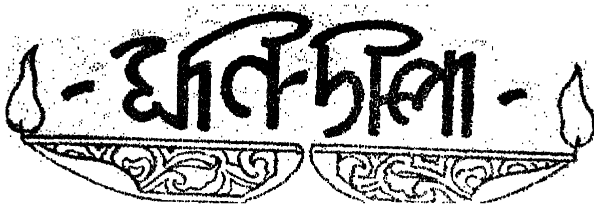


ম্লান আঁখি-তলে জল ছল-ছলে কত না,
কে মুছায় বল্ এই বিহ্বল বেদনা ?
ফণা হেনে যায় দেহে বিরহের নাগিনী—
তারি বিষ হায় হ'রে নিতে চায় চেতনা।

কে আছে স্বজন করিবে মোচন ব্যথারে,
ঘুচাইবে ভেদ এই বিচ্ছেদ-পাথারে।
হায় বঁধু মোর, এ ব্যথা কঠোর—অসহ—
করো পরাভব মিলনের সব বাধারে।

মীরাবাঈ

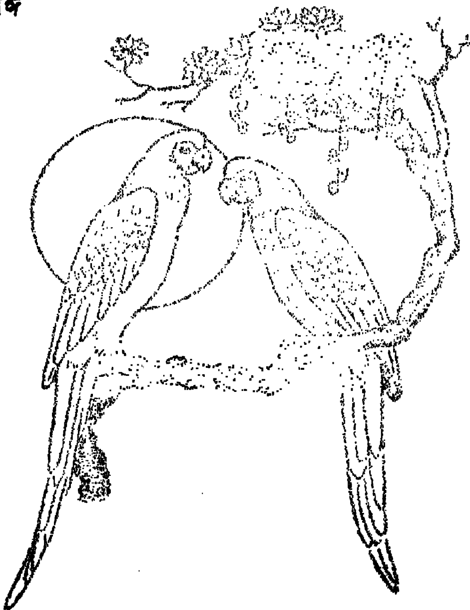




বৈরিতা

হায় পাপিয়া, তোমার সাথে
কিসের আমার বৈরিতা,
ডাক্‌ছ তুমি 'পিয়া' 'পিয়া'—
পার্‌ছি না যে সইতে তা।
কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে
গান যে তোমার হান্‌ছে গো,
হৃদয়টারে চৌচিরিয়ে
করাত দিয়ে টান্‌ছে গো।
শাখায় ব'সে ডাক্‌ছ তুমি—
পিয়ায় ডেকে চাইছ রে,
মীরার বঁধু নেইকো কাছে—
নয়ন ঝুরে তাই তো রে!

মীরাবাঈ





মীরার ব্যথা

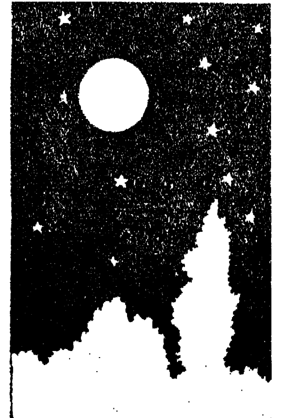
এসো তুমি, সাঁঝ এসেছে—ঘনিয়ে এলো আঁধার ঘোর,
আনন্দ আজ উথল হ'বে তুমি এলেই বন্ধু মোর।
সূর্য্য এবং ধরা মোরা—এড়িয়ে যাবার জো-ই যে নাই,
মন বোঝে না—মীরার হিয়া হামেসা চায় তোমায় তাই

✻

সুপ্ত জগৎ—বিরহেতে আমিই কেবল জাগ্‌ছি রাত,
গাঁথ্‌ছি ব'সে মোতির মালা—কর্‌ছি আরো অশ্রুপাত।
গাঁথ্‌ছি মালা অশ্রুজলের—তারা গুণে' রাত পোহায়,
মীরার বঁধু ফির্‌বে কখন—শুভ সময় ঐ যে যায়!

✻

মাতাল যারা—মদের লাগি' তাদের যেমন মন অধীর,
প্রাণের নিধি প্রিয়ের লাগি' তেমনি হৃদয় নয়কো থির।
কেউ বা করে বন্দনা আর, কেউ বা দেখায় নিন্দা ভয়,
বন্ধু আমার মন হ'রেছে—ফিরে' চাওয়ার নেই সময়!





দাঁড়াও আমার আঁখির আগে—চোখের সাথে মিলাও চোখ,
আমায় ভুলে' যাওয়াই তোমার বিস্মরণের ব্যাপার হোক্।
ভাস্‌ছি ভব-সাগর বুকে—নাওগো তুলে' মিটাও খেদ,
সেই মিলনে মিলাও আমায়, যে মিলনের নেইকো ছেদ।



স্নেহের বাঁধন ছিন্ন ক'রে বন্ধু, তুমি কোথায় গেলে ?
তোমার পরেই ভরসা যাহার, চ'লে গেলে তারেই ফেলে !
ভাসিয়ে তরি রেখে গেছ, এই বিরহের দরিয়াটায়,
বন্ধু তুমি আস্‌বে কবে ? আর থাকা যে যায় না হায় !



হৃদয় আমার যে হ'রেছে দেখ্‌ব তারে সর্ব্বক্ষণ,
তাহার ধ্যানে—তার স্মরণেই মগ্ন হ'য়ে রইবে মন।
চরণ তাহার পড়্‌বে যেথায় ধরার হ'বে তীর্থ সেই,
মগন হ'য়ে রইবে মীরা তীর্থ-রেণু—তার তলেই।

মীরাবাঈ

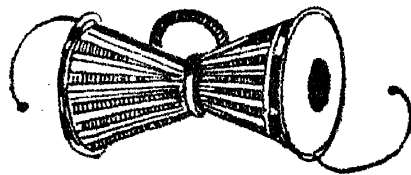




আগমনী

ঝরিছে বাদল শ্রাবণের,
ঘন ঘন মেঘ গর্জ্জন,
বঁধুয়ার ঐ চরণের
ধ্বনি আসে তাই শোন্ মন।
আসে ঝড়, ঝলে বিদ্যুৎ,
কালো মেঘে ঘেরে অম্বর,
এ কি ধারা তার অদ্ভুত!
বাতাসেতে স্নেহ-নির্ঝর।
এ তো নহে লীলা বর্ষার,
নহে প্রলয়ের তাণ্ডব,
এ গান মীরার বঁধুয়ার,
তারি আনন্দ উৎসব।

মীরাবাঈ







মিলনোৎসব

বেলা ব'য়ে যায় ফাগুনের,
শেষ বুঝি হয় তার দিন,
আজ বসন্ত-উৎসবে
মীরা তুই মন কর্ লীন।
বাজে বীণা, বাজে পাখোয়াজ
করতালে ওঠে ঝঙ্কার,
অনাহুত রাগ-রাগিনী—
রোমে রোমে দোলে তান তার।
গুলে' সন্তোষ সুনিবিড়
পীরিতি ছুঁড়িছে পিচ্‌কারী,
বাদলের মতো ঝর্ ঝর্
ঝরে আনন্দ আজ তারি।





খুলে' দাও বাঁধ্ হৃদয়ের,

লোক লাজ ভুলে' যাও সব,

গৃহে আসে তোর প্রিয়তম,

খেল্ হোলি—কর্ উৎসব !

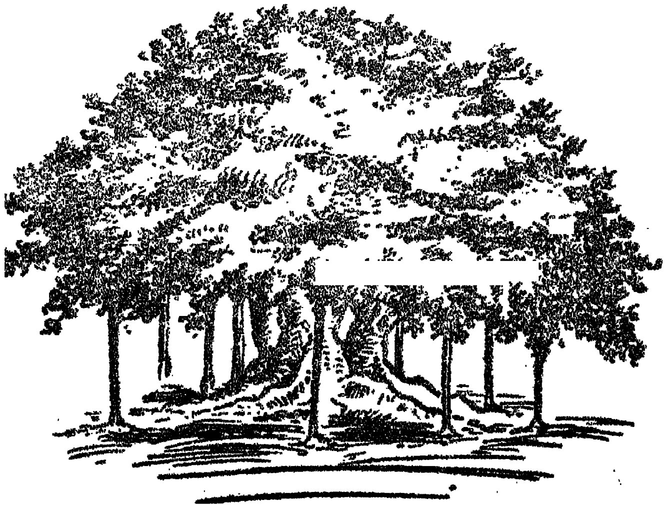
বন্ধু, তোমার পদতল—

শতদল একি অপরূপ !

ওরে মীরা, তোর বঁধুয়ার

বরণের লাগি' জ্বাল্ ধূপ।

মীরাবাঈ





শেষ কথা

নিত্য সিনানে হরি যদি মিলে হায়,
জলের জন্তু অমন হাজারো আছে।
ফল-মুল খেলে তাঁরে যদি পাওয়া যায়,
বানর রয়েছে কাননের গাছে গাছে।
হরি মিলে যদি তৃণ ভোজনের ফলে,
মৃগ ও অজার অভাব কিছু তো নাই।
পত্নী ছাড়িলে হরি মিলে যারা বলে,
সন্ধান তাঁরা করুন খোজার ঠাঁই।
হরি মিলে যদি দুগ্ধ করিলে পান,
মাঠে মাঠে তবে আছে গো-বৎস দল,
মীরা কহে—শুধু প্রেমে মিলে ভগবান,
ওখানে চলে না কোনো ফাঁকি—কোনো ছল

মীরাবাঈ



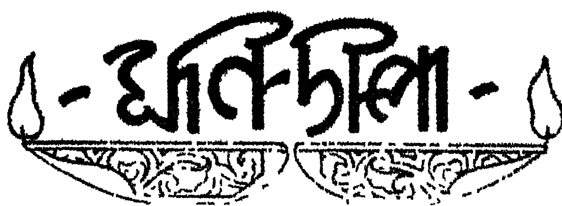


পরশমণি

কুড়ায়ে আমি পেইছি মণি শোনো,
রতন আমি পেইছি বুকের মাঝে,
এ ভূষণ যে ক্ষয় জানে না কোনো,
চুরি এরে চোরেও করে না যে।
আগুন এরে পুড়্‌তে নারে মাগো,
দীপ্তি বাড়ে যতই কাটে দিন,
ডোবে না এ যত জলেই রাখো,
আমার রতন নিত্য অমলিন।
বিচিত্র এ বিরাট অপরূপ—
ধরার ছোঁয়া ছাড়িয়ে চ'লে যায়,
ভজন গানের গন্ধে জ্বালায় ধূপ,
দীপ জ্বলে তার সুরের ঈশারায়।
তরির মতো আমারি এই রতন
ভব-সাগর—তারেও করে পার,
মীরা বঁধু—তাঁরি রাতুল চরণ
চির শরণ পরশমণি তার,

মীরাবাঈ





হোলিখেলা

শরীরের মহলায় আজ বাজে বাজ্না,
ছত্রিশ রাগ্ ভাঁজে সুর যে,
পীরিতির হাতে দোলে তামাসার দোল্না,
বন্ধুর হাতে ফাগ ঝুর্ছে।
খেলিতেছি রঙ্ আজ বঁধুয়ার সঙ্গে,
দূরে গেছে লাজ আর শঙ্কা,
আজ ধরা মনোহর কৌতুক রঙ্গে,
অনুরাগে বাজে জয় ডঙ্কা।

শরীরের নগরীতে হোলি স্বামী খেল্ছে,
গানে গানে মন আজ ক্ষিপ্ত,
সুর আজ সব দিকে ফণা তার মেল্ছে,
আনন্দে সব দিক দীপ্ত।





তন্ত্র-তল মুখরিত বাদ্যে ও নৃত্যে,
ঝক্ মক্—সব জ্যোতিমন্ত,
সহজ যে রঙ্ তাই পুলকিছে চিত্তে,
এ রঙের নাই আদি-অন্ত।
তানপুরা নাই তার—নাই করতালরে,
তবু ধ্বনি ভরে মহাশূন্য,
বিনা রসনায় ওকে বোনে সুর-জালরে,
আনন্দে করে দেশ পূর্ণ।
মোর সাথে বঁধুয়ার চিরদিন হায়রে,
এমনই হোলিখেলা চল্‌ল,
পথপানে চেয়ে চেয়ে জন্মও যায়রে,
লুকোচুরি ধরা নাহি পড়্‌ল্।

তাই হোক্-বাণী তার চাই নাকো শুন্‌তে,
নেই সাধ নয়নেও দেখ্‌বার,
আমি চাই প্রাণে প্রাণে শুধু তারে জান্‌তে,
সাধ শুধু বুকে বুক রাখ্‌বার।

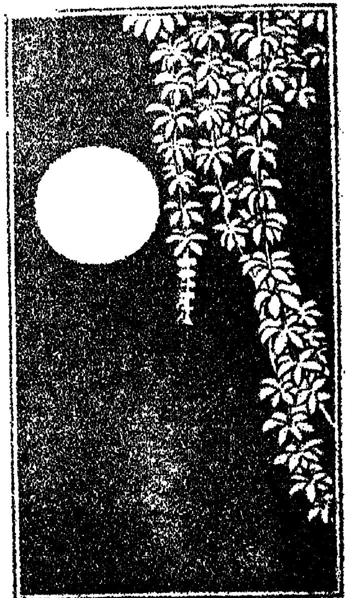


মণি-ডালা

মঙ্গল হোলি খেলো—করো নিতি উৎসব,
বন্ধুর দেহ-পরে করো ফাগ বর্ষণ,
ধরণীর নর-নারী উৎসব করো সব,
করো জন্মের সেরা সম্পদ অর্জ্জন।

লও ফাগ—বঁধুয়ার পদ-রেণু-চূর্ণ,
ছেড়ে এস কুল-শীল, লজ্জার দম্ভে,
চরণের ধ্যানে হোক্ অন্তর পূর্ণ,
উড়াও নিশান ঐ অভয়ের স্তম্ভে।

মঙ্গল উৎসব, কীর্ত্তন-কথা আর,
সাধনার পরে হোক্ সাধনার ভিড়্ গো,
কবীর যা কহে আজ সত্যের তাই সার—
ব্যর্থ হ'বে না কারো লক্ষ্যের তীরগো।

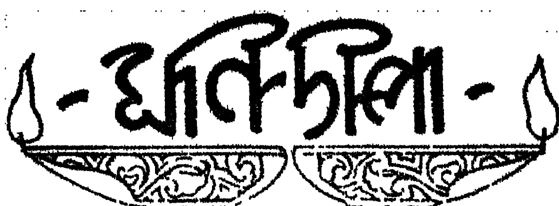




এই দেহ পেয়েছ যে—ভাগ্য তো সেই ঢের,
জাগাও বসন্তের উৎসবে চিত্ত,
বিনা জিহ্বায় ঝরে সঙ্গীত স্বর্গের,
বিনা পায়ে চলিয়াছে অসীমের নৃত্য।
নেই হাতে যন্তর—তবু সুর ঝর্‌ছে,
বিনা চোখে খুঁজে' নাও এ লীলার কুঞ্জ,
মৃত্যু ছাড়াই হায় সব লোক মর্‌ছে,
অগ্নি বিনাই বাড়ে ভস্মের পুঞ্জ।

অভিলাষ পুরায় যে কিছু নাহি চাহিতেই,
সেই জানে কি ফিকির সব বাজি জিত্‌বার,
বিনা দীপে অখণ্ড শিখা তার জ্বল্‌ছেই,
সেথা পাপ-পুণ্যের স্পর্শও নেই আর।
বসন্তে কবীর যে পেয়েছেরে চিত্তেই,
তাই রবি-চন্দ্রেরো দরকার নেই তার।





সম্মুখে হোলি খেল্ ওরে মন, আগে জাগাও চিত্তরে,
তার পরেতে উৎসবে হও প্রবৃত্ত,
বঁধুর সাথে এক হ'য়ে যা, খেল্ হোলি তুই নিত্যরে,
নে জিনে' ঐ চরণ-তলের সুতীর্থ।
সত্যরে নাও সঙ্গী ক'রে—মনও রাখো তার পানে,
কণ্ঠ ভরো মঙ্গলেরি সঙ্গীতে,
ঘুরে' ঘুরে' জন্ম গেল, চিন্‌লি নে হায় কল্যাণে,
চিন্‌লি নে প্রেম মিথ্যা মোহের ইঙ্গিতে।
অহঙ্কারের জমাট কালি, আর কামনার বিরাট জাল,
এদের সাথেই পড়্‌লি বাঁধা শৃঙ্খলে,
তাইতো রে হায় মৃত্যু পরে মৃত্যু এসে ঠুক্‌ছে তাল,
অন্ধ নয়ন বুঝ্‌ছে না তার কৌশলে।





তিন ভুবনেই আজ চলেছে বসন্তেরি দোল-লীলা,
তুমিই কেবল পড়্‌লে মোহের খপ্পরে,
মনের মিতা—তারে ফেলে সেবকেরেই কোল দিলা,
দেব্‌তা ফেলে কুড়িয়ে নিলে প্রস্তরে।
কত সুযোগ এলো গেলো, রইলে তুমি বিস্মৃত,
এবার তুমি জাগো মরম-সন্ধানী,
অনাদি ঐ প্রেমের সুধায় মনরে করো মজ্জিত,
আর চ'লো না ঐ মরণের জের টানি'।
মনের মাণিক সামাল ক'রে প্রেমের খেলায় হও সজাগ,
বুকের মাঝে নাও টেনে প্রাণ-বল্লভে,
ডুবে' প্রিয়তমের প্রেমে নাও কুড়িয়ে তার সোহাগ,
সুধার সোয়াদ এম্‌নি ক'রেই জীব লভে।
প্রেমের গানের গুঞ্জরণে নাও মিলিয়ে মূর্চ্ছনা,
তারই তালে বাজাও মৃদঙ্‌ দিল্‌ খুলি',
আদি সুরেই জান্‌তে হ'বে; চল্‌বে না তায় বঞ্চনা,
সেই সুরেতে ভরো নিজের গানগুলি।







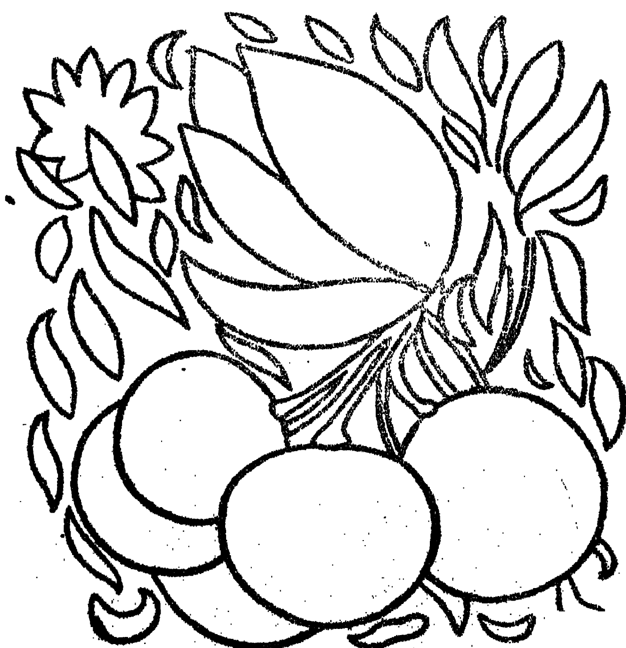
ভেদ ভুলে' যাও রাত্রি-দিনের—মাতাও হৃদয় উৎসবে,
বঁধুর প্রণয়—হোক্ সে তোমার তপস্যা,
চিত্ত ভরো প্রিয়তমের পরিচয়ের গৌরবে,
যাক্ ঘুচে' সব দ্বন্দ্ব-প্রেমের সমস্যা।
প্রীতি এবং সন্তোষেরি সৌরভেতে সন্তরি',
সুরভিয়া তোলো মলিন অঙ্গরে,
আবীর-গুলাল ধারার মতো পড়ুক ঝ'রে ঝর্ঝরি'—
আগুন ধরাক্ তাহাই তোমার অন্তরে।
নৃত্য করে দিগ্বিদিকে সুশ্রী নব-যৌবনা,
মিলেছে আজ সবাই একই অঙ্গনে,
বঁধুর সাথে চল্‌ছে তাদের হোলি খেলার অর্চ্চনা,
খেল্‌ছে হোলি বসন্তেরি মৌ-বনে।
আলয় হ'লো সুরভিত কুঙ্কুমেরি সুগন্ধে,
বঁধুর সাথে খেলার লীলা চল্‌ছেরে,
ফাগের রঙে রাঙা হ'য়ে ঝর্‌ছে আলো আনন্দে,
রঙের আভা ভুবন ভ'রে জ্বল্‌ছেরে।





স্বজন যারা তারাই তো আজ, দুল্‌ছে খেলার এই দোলায়,
তারাই জানে এ উৎসবের মর্ম্ম গো,
'অনজানা'রা আপন মনে মিছেই ব'কে মর্‌ছে হায়,
কেই বা রাখে তাদের কথায় কর্ণ গো।
কবীর কহে বিচার করি'—যাচাই করি' সত্যরে,
—ঘুচিয়ে এসো সব তৃষারে নিঃশেষে,
খেলো হোলি এম্‌নি ক'রেই—প্রভু তোমার যার জোরে,
নফর হ'য়ে রইবে জেগে দ্বার-দেশে।

কবীর





বন্ধু-বিরহে

দর্শন তব দুর্লভ বঁধু,
পাই নে তোমারে বক্ষে হায়,
তাই তো আমার উন্মাদ মন
গুমরিয়া ওঠে যন্ত্রণায় !
সখীদের সাথে কত ঠাঁই গেনু,
দিনু কত পূজা অর্ঘ্য আর,
পেলাম না তবু বন্ধু, তোমারে—
জের টেনে চলি ব্যর্থতার !
বয়স যে হায় খ'সে ঝ'রে যায়,
মিলে না মনের বন্ধু ওরে,
জরা এসে ঘেরে সারা তনু-মন,
বৃথা অনুতাপে চিত্ত ভরে।





পর্ণের মতো দেহের বর্ণ
পীত হ'য়ে গেল জ্বালায় দহি',
দেহটাও হায় সেও গলে যায়
প্রতিদিবসের পীড়ন সহি'।

আগুন লাগুক্‌ সেই যৌবনে
পুড়ে' যেন তায় ভস্ম ঝরে,
প্রিয়তমে ছাড়া আন্‌জনে হায়
যে আনে তাহার শয্যা-পরে।

প্রিয়তম আজো হ'লো না আমার—
সত্যের বাণী ডাকিয়া কয়!
কবীর জেনেছে—তাঁরে পেতে হ'লে
আগে নির্ব্বাণ লভিতে হয়।

কবীর





মণি-কণা

খেল্‌ব প্রিয়তমের সাথে—রাখ্‌ব বাজি জীবন-মন,
হারি যদি আমি বঁধুর, জিত্‌লে বঁধু আমার ধন।
এই খেলাতেই মিলন জাগে—কিন্তু বঁধু কোথায় হায়?
একলা ব'সে চাইছি পথে—ঝুর্‌ছে দুখে দুই নয়ন।



জাগ্‌ সোহাগী,—বঁধুর ঘরে এলো তোমার দিন যাবার;
ঝিল্‌মিলি ঐ জ্বল্‌ছে আলো—প্রেম-সায়রে দাও সাঁতার
কবীর কহে—ধন্যরে সেই বঁধুর রঙে রঙ্গী যে,
অমর-লোকে বিশ্রামেরি গ'ড়ে ওঠে ঘর তাহার।



দেহের তটে যে কাম রাজে সেই তো গড়ে মরণ-গড়,
তারে ছেড়ে পেয়ালা তোর উছ্‌লে-ওঠা সুধায় ভর্‌।
গগন ছেপে গান ঝরিছে, সেই গানেতে মিলাও সুর,—
কবীর কহে—প্রেমের রাগে বন্ধুরে তুই সজাগ কর্‌।



মনি-চিলা

স্বামীরে তুই চিন্‌লি নারে, বড়াই করিস্ হায় পাগল,
শুধু কথায় হয় না মিলন—ভাঙ্‌তে হ'বে ছল্-আগল।
কথার জালে জড়িয়ে প'ড়ে হারাস্ নেরে পথের চিন্,
চাওয়ার মতো চাইলে পরেই প্রেম-সাগরের মিল্‌বে তল।

প্রেমের ও পথ নিলেই যদি বন্ধু, কেন ঘুমাও তবে,
পেয়ে যদি থাকোই কিছু,—কিছু তবে দিতেও হ'বে।
চোখে যখন নিদ্রা ঘনায়, শয্যা তখন না-ই বা হ'লো—
মাথা দিতে তৈরী যে জন, তারও চোখে ঝর্‌ণা ব'বে ?

সব মহালেই ভ্রমের তালা—প্রেমের চাবি লাগাও তায়,
কপটতার কপাটটারে ফেল্‌রে খুলে'—সময় যায়।
প্রিয়তমে তোল্ জাগিয়ে মন-ভবনের মধ্যে তোর,
কবীর কহে—সুযোগ পেলে তারে কি হয় ছাড়্‌তে হায় !





শুভরাতে আজ পিয়ারী, মিছেই শু'য়ে রইলি দূর,
বন্ধু আসেন—প্রাণে প্রাণে বাজে তাঁহার আসার সুর।
লাজুক বধূ, লজ্জা রাখো—ঘোম্‌টা তোমার দাও খুলে',
মুখখানি তোর দেখার লাগি' বঁধুর হিয়া আজ বিধুর।

নয়নে তাঁর অশ্রু ঝরে, যুগের মালা হাতের পর,
কি চা'ন তিনি আমার কাছে ?······উজল হ'লো আমার ঘর
কবীর কহে—চিত্ত ওরে, পরাণ ভ'রে নে তায় দেখে,
যেমন ক'রে হৃদয় চাহে তেমনি ক'রেই বক্ষে ধর্‌।

দিনের শেষে সন্ধ্যা নামে, চক্রবাকী ত্রস্তে কয়—
চলো চখা,—সেথায় চলো যেথায় নাহি রাত্রি হয়'।
সাঁঝে তারা পৃথক হ'লেও ভোর না হ'তেই আবার মিলে,
প্রেম-হারা যে তাহার মিলন দিবস-রাতে কোথাও নয়।



গুণীর হাতে যন্ত্র বাজে—ঝর্‌ছে রে সুর, হর্‌ছে মন,
মিঠে সুরের ঝঙ্কারেতে মুখরিত দূর গগন।
তুমিই বাজাও—তুমিই গাহ, সুরের দোলায় দাও দোলা,
এক রাগেতেই সব রাগিণীর সুর বাজিছে রণন্ ঝন্।

দীপ্ত হ'লো গগন-গৃহ, ঝর্‌ছে বাণী—নেইকো শেষ—
অসীম সুরে ঝর্‌ছে বাণী—লাগ্‌ল তাতেই উল্টো রেশ।
কবীর কহে—যন্ত্র ছাড়ি' যন্ত্রীতে যে মন লাগায়,
চিত্ত তারই হয় বিবেকী, রয় না রে তার মোহের লেশ।



চপল মনও অচল হ'লো, রঙ্ লেগেছে মনের গায়,
তত্ত্বে পেলাম তত্ত্বাতীতে—সাথের সাথী মিল্‌ল তায়।
সঙ্কীর্ণতার বাঁধ্ ভেঙেছি, বাঁধনেতেও বাঁধন-হীন,
অ-পাওয়ারে আজ পেয়েছি—প্রেমের রঙে ভর্‌ল কায়।





আজ মুরলীর ঝর্‌ণা ঝরে, চিত্ত ভরে আনন্দে,
বিনা দীপেই জ্বল্‌ছে আলো—কমল ঝরায় সুগন্ধে।
চকোর যেমন চন্দ্রে যাচে—চাতক স্বাতীর ধারায় চায়,
তেম্‌নি প্রিয়া মোর জনমেও ভর্‌ল প্রেমের স্বছন্দে।



প্রিয়তমের বিরহেতে হৃদয় আমার ব্যথায় ছায়,
দিবসে নেই সোয়াস্তি গো—বিনা ঘুমেই রাত্রি যায়।
ভয়ে মরি—আঁধার রাতি, প্রহর পড়ে পিছ্‌লে রে,
কবীর কহে—বন্ধু এলেই দখিণে ফের বইবে বায়।



কীটের পায়ে নূপুর বাজে—তাহাও পশে কর্ণে যার,
মোল্লা তারেই ডাক্‌ছে হেঁকে—বন্ধু কি হায় বধির তার ?
মালা-তিলক-জটার জালে জিন্‌তে তারে চায় সবাই,
খোঁজ রাখে না অন্তরে যে লুকিয়ে আছে ছুরীর ধার।





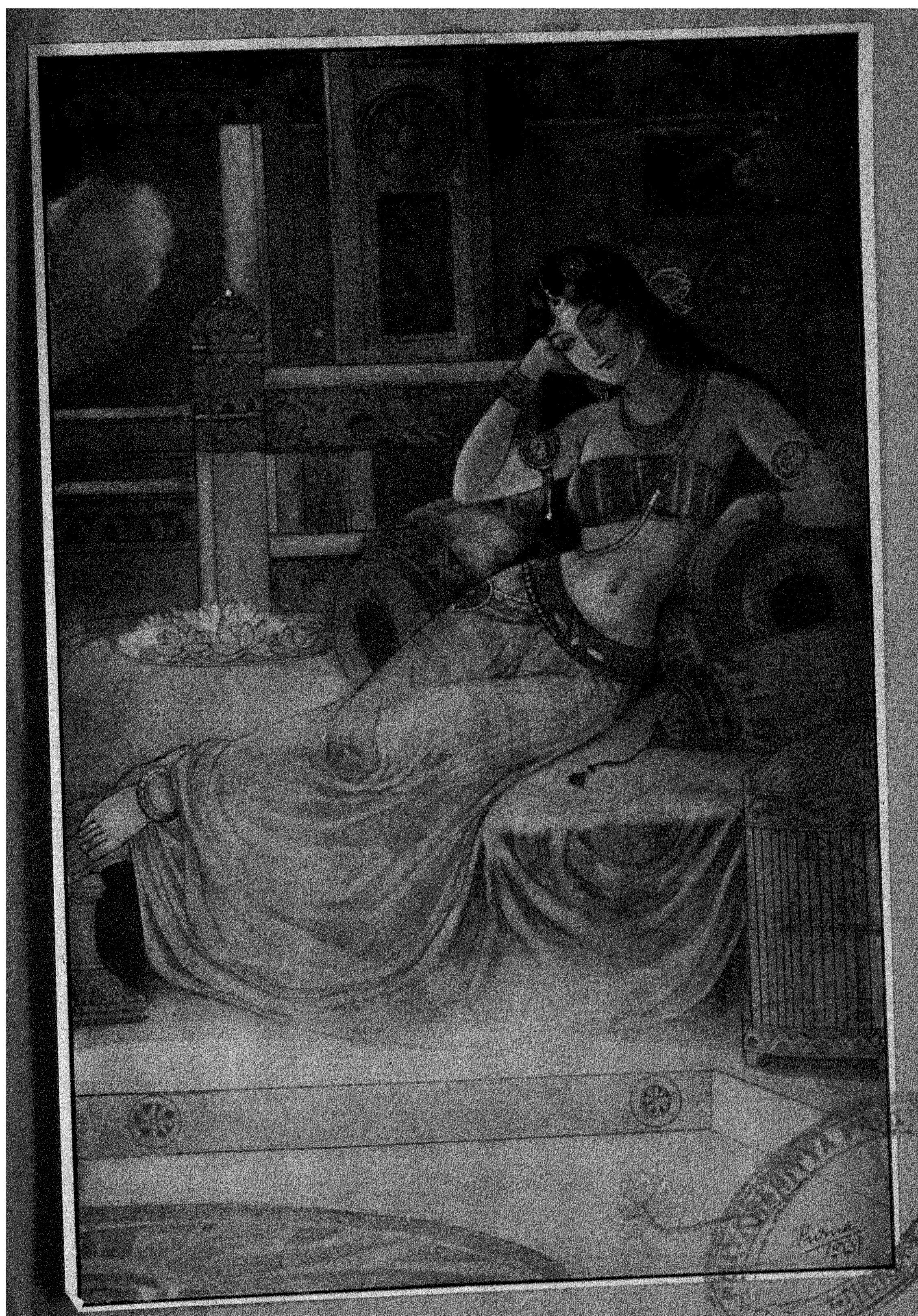
মোর এ তরুণ দেহের পানে বন্ধু, তুমি চোখ্ ফিরাও,
বিমুখতার শায়ক দিয়ে আর বিঁধো না আমার গাও।
অগ্নি-দাহ—সইবে সেও, বিমুখতাই সইবে না,
মিনতি মোর—সারা দেহে আলিঙ্গনের ঝড় বহাও।

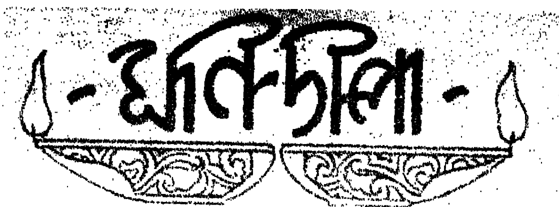
তোমার এবং আমার মাঝে ব্যবধানের কারণ নাই,
কান্তা আমি তোমার হ'বো—সাধনা তো আমার তাই।
কবীর কহে—হে প্রিয়তম, কহ তবে কিসের লাগি',
তোমার প্রীতির মাঝখানেতে হ'বে নাকো আমার ঠাঁই?



সংসারে হায় সবাই রোগী, বৈদ্য—তারি নেইকো খোঁজ,
মিথ্যা গুরু—তারই পূজা এই হুনিয়ায় চল্‌ছে রোজ।
সত্যরে কেউ চায় না ফিরে'—অন্ধ অন্ধের ধর্‌ছে হাত,
পথের রেখা দেখার লাগি' আজ্‌গুবিরই চল্‌ছে ভোজ!




Pusna
1931.



তীর্থ সে যে জল কেবলি স্নান ক'রে তাই পেলাম টের,
মূর্ত্তিগুলো জড় ভরত—কাট্‌ল ডেকেই মোহের জের।
পুরাণ-কোরাণ কেবল কথা—ঢাক্‌না খুলে' বুঝ্‌নু তাই,
কবীর কহে—অনুভূতি এ যে গোপন অন্তরের !



ভিখারী আজ তোমার দ্বারে, দাও দরশন বন্ধু মোর,
তুমি বিনে তৃপ্তি কোথা, খোলো তোমার রুদ্ধ দোর।
উদার তুমি, প্রেমিক তুমি, তুল্য তোমার নেই কোথাও—
তোমার যশের সুরভিতেই নিখিল জগৎ আজ বিভোর।

তাই তো আজি যাচ্‌ঞা আমার তোমার কাছেই কর্‌ছে ভিড়,
দীনের কাছে কে-ই বা চাহে সুধার ধারা—মুক্তি-ক্ষীর।
কবীর কহে—দানের মালিক সেই তো আছে শক্তি যার,
তুমি যদি মিলাও নিধি কেই বা ডরে বাধার তীর।

কবীর





শ্রাবণে

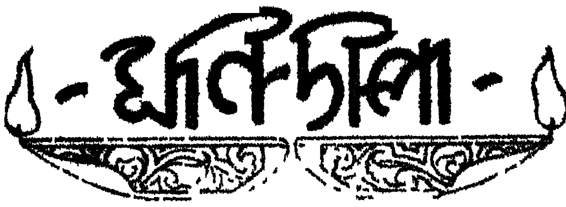
অজ্ঞেয় বঁধু ব'সে আছে ঐ আকাশ পারে,
হরিৎ বসনে ধরণী সেজেছে তাহার লাগি' ;
পৃথিবী আজিকে বসুধা বিবিধ ফুলের ভারে,
রূপসী ধরার জয়-গান গাহে গগন জাগি'।
কালের আননে কালী পড়ে গেছে—জলে-স্থলে
তারি উৎসব সু-কাল চলেছে নিত্য যার,
প্রেমের মাধুরী ঘন ক'রে তোলে মেঘের দলে,
ঐ ঝর্ ঝর্ ঝরে বারি—ঝরে অমৃত-ধার।



শ্রাবণের শোভা দাদু তুই দেখ্ ধ্যানের চোখে,
কত যুগ গেছে ধরার হরিৎ হয়নি ক্ষয়,
রস ম'রে যায়, মন প'ড়ে থাকে পঙ্গু শোকে,
বুড়া মন—তবু দেহে যৌবন জাগিয়া রয়।

দাদু দয়াল





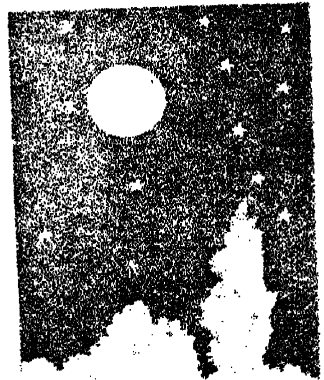
দাদুর দুঃখ

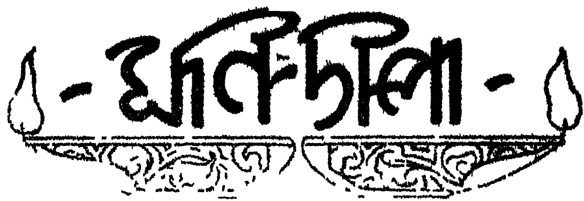
কঠিন জীবন নাহি যায় !
সুন্দর বঁধুয়ার দরশন বিনে হায়,
দিন-রাত অযথা মিলায় ।

প্রহর বসিয়া থাকে যুগের পাথর সম,
রাতি হয় জাগরণে ভোর,
পেলাম না আজো তারে, দূরে দূরে রহিল সে
যে আমার হৃদয়ের চোর ।

পথের উপরে হায় নয়ন ফেলিয়া রাখি,
দেখার পূরে না তবু সাধ,
ব্যাকুল চকোর সম বিরহ-বিধুর দাদু,
পেলো না সে সুধার সোয়াদ ।

দাদু দয়াল





দু'য়ের আরতি

গন্ধ কহিছে—পুষ্পেরে আমি চাই,
ফুল ডেকে কহে—গন্ধরে আমি যাচি,
ভাষা কহে— আমি সত্যরে যেন পাই,
সত্য কহিছে—ভাষারে খুঁজিতে আছি।

রূপ কহে—আমি ভাবের কামনা করি,
ভাব কহে—চাহি রূপেরে অনুক্ষণ,
দু'য়ের আরতি চলেছে নিখিল ভরি'
অগাধ এ পূজা—অনুপ এ আয়োজন!

দাদু দয়াল



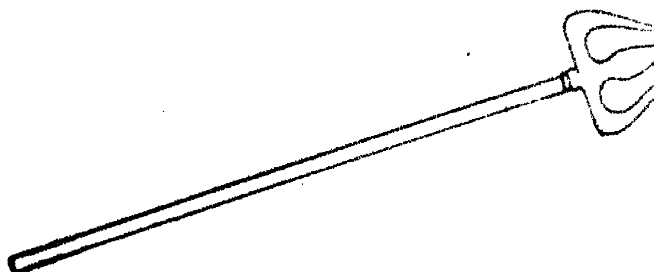


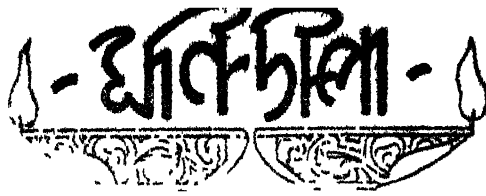
সুরদাসের প্রার্থনা

নয়নে যাহার নীল পদ্মের লেখা—
বন্ধু আমার ফিরে' সে আসিবে কবে?
একটি নিমেষ—বারেক তাহারে দেখা—
বুক ভ'রে ওঠে পুষ্পের গৌরবে।

ফুল আছে বুকে—নাই আনন্দ-ভার,
বন্ধু-বিহনে আগুন ঝরায় তারা,
কোরকে ফুটাবে খুশীর স্পর্শ যার,
চিত্তে আমার সেই নাহি দেয় সাড়া।

বিরহ গড়িছে কুঁড়িরে বর্শা করি',
হৃদয়ে বিঁধিয়া ব্যথায় ভরিছে বুক,
সুন্দর-আঁখি বন্ধু, তোমারে স্মরি,
বেদনায় হানো হাস্যের কৌতুক।

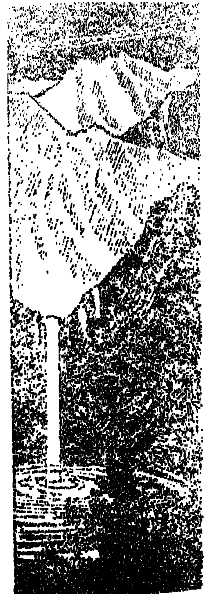




স্মৃতির বেদনা নয়নে গড়িছে নদী,
অশ্রু-পাথারে ভাসিছে শয্যাতল,
এই দরিয়ায় পার হ'তে পারি যদি,
পাবো মিলনের আনন্দ উচ্ছল।

শেষ-মিলনের সম্পদ যদি পাই,
মৃত্যুও মোর হয় না শান্তি-হীন,
বন্ধু আমার, তাই তব সাড়া চাই,
জীবন বেলায় ফুরায়ে যে আসে দিন !

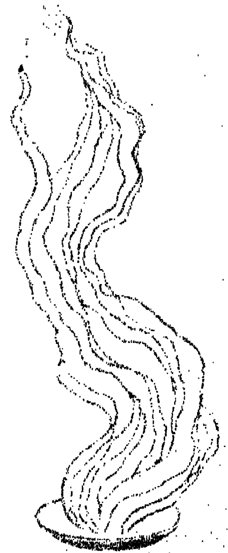
সুরদাস



সর্ব্বহারা

ভালো যে বেসেছে তার বিশ্বাসেই শুধু অধিকার,
সুখ তার ভাগ্যে নাই—বিশ্বাসেই পেতে হ'বে সুখ।
মরণ ঘনায়ে আসে, প্রিয়তম, তোমারি ও মুখ,
জাগিছে নয়নে তবু—শেষ নাই তবু প্রতীক্ষার।
পতঙ্গ ঝাঁপায়ে পড়ে, অনলে খেয়াল নাহি তার—
হে বন্ধু, তোমারি প্রেমে ওরি মতো ভরা মোর বুক,
সেই হরিণেরি মতো চিত্ত মোর হ'য়েছে উন্মুখ,
সুর-মুগ্ধ বক্ষে যার শিকারী হানিছে তলোয়ার।
কপোতের ক্ষীণ পাখা বায়ু ভেদি' উঠে নভ গায়,
তারপর লুটে' পড়ে নিষ্পন্দ নিঃসাড় প্রাণ-হীন,
নির্জ্জনে চকোর কাঁদে—বঁধুয়ায় খুঁজে' নাহি পায়,—
খুঁজে' খুঁজে' ফিরিতেছি হে বন্ধু, তোমারে নিশি-দিন।
খুঁজিতেছি নিশি-দিন—পলে পলে বেলা ব'য়ে যায়,
সর্ব্ব-হারা ব'সে আছি পরিত্যক্ত—নিঃসঙ্গ—মলিন।

সুরদাস





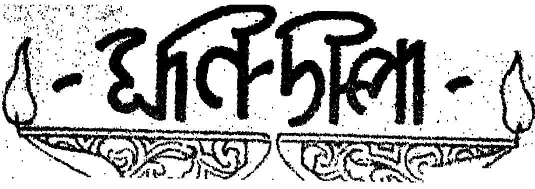
হাসি-কান্না

ভূমিষ্ঠ তুমি হয়েছ যখন
সবাই হেসেছে তোমারে চেয়ে,
তুমিই কেবল উঠেছিলে কাঁদি'
করুণ কণ্ঠে ভুবন ছেয়ে।

যাবার সময় হেসে যেয়ো তুমি
দিব্য কীর্ত্তি-বিমানে চড়ি',
তোমার বিরহে আর সকলেরি
চোখে যেন ওঠে অশ্রু ভরি'।

তুলসীদাস





বিরাট

গগন-রূপ ঐ থালার পরে
রবি-শশীর প্রদীপ জ্বলে,
মুক্তা-মালা উঠ্‌ছে গ'ড়ে
সংখ্যা-বিহীন তারার দলে।

ধূপ হয়েছে মলয় অনিল—
সেই পবনই চামর ঢুলায়,
বন-তলের বুকে বুকে,
পুষ্প—আলোর স্পর্শ বুলায়।

মহান্ তোমার আরতি সে,
হে ধরণীর চির-শরণ,
অনাহত শব্দ উঠে,
বাদ্য বাজে রণন্ ঝনন্।





চোখ যদিও নাইকো তোমার—
হাজার আঁখি চেয়েই আছে,
হাজারতর মূর্ত্তি তব,
দাও না ধরা লোকের কাছে।

পদ-বিহীন হে নাথ, তোমার
হাজার পায়ে কমল ফুটে,
গন্ধ-হারা, গন্ধে তোমার
এই জগতের চিত্ত লুটে।

তোমার আলোই ঠিক্‌রে পড়ে
সবার মাঝে—সকল দিকে,
দিগ্বিদিকে তোমার রূপই,
বান ডাকিছে—উঠ্‌ছে ফিকে।





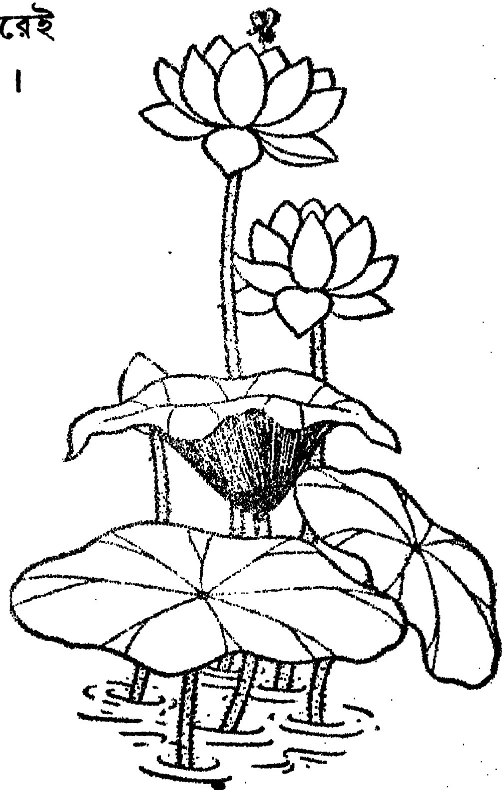
ধ্যান-দীপা

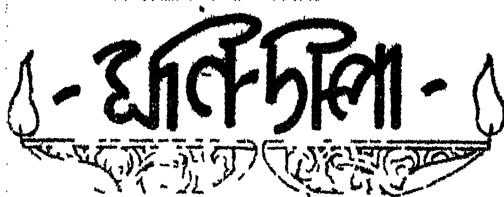
গুরুর দেখা মিল্‌ল যাহার,
এই জ্যোতিরে সেই তো জানে,
আরতি সেই কর্‌তে পারে,
অন্যে কি এর বুঝ্‌বে মানে ?

হরির চরণ-কমল পরে
ঝর্‌ছে সুধার ঝর্‌ণা যে গো,
তৃষ্ণা-কাতর চিত্ত-চকোর,
সেই খানে আজ ধর্‌ণা দে গো

চাতক সমান নানক আজি,
ঢালো তোমার কৃপার বারি,
তোমার নামের গানের জোরেই
চায় সে দিতে খেয়ায় পাড়ি।

নানক

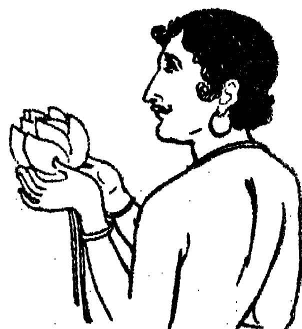


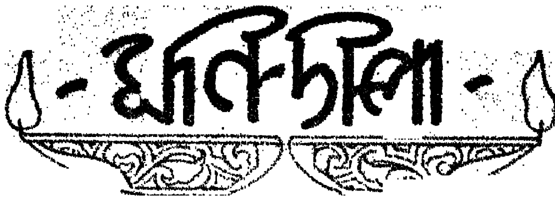


নিন্দুকের প্রতি

নিন্দুক বেঁচে থাক্ যুগ যুগ,
কামনার সিদ্ধিরে দেয় সে যে নিত্য,
কামনার সিদ্ধির দেয় সুখ,
সে যে বিন্-পয়সার বিশ্বাসী ভৃত্য।
তিন লোক জাগায় সে একলাই,
তাল ঠোকে—তারি সাথে কোমরও কস্‌ছে।
বিচ্ছেদ তার সাথে মোর নাই—
দিন-রাত সে আমার সঙ্গেই চল্‌ছে!
সঙ্গেই লেগে থাকে রাত-দিন,
প্রেম ভরে দেয় গা'ল—নেই তায় কষ্ট,
চিত্তেরে করে দৃঢ় ভয়হীন,
মিথ্যা মানের মোহ সেই করে নষ্ট।
নিন্দুক গুরু মোর—তার ঐ
অনুগ্রহেই নাম মনে মোর পড়্‌ল,
মঙ্গল হোক্ তার নিত্যই,
সাধনার সব বাধা সেই মোর হর্‌ল।

পল্টুদাস





নিমন্ত্রণের পত্র

প্রভাতে যখন এলে তুমি দূত,
সোনালী পোষাক তোমার গায়,
নিঃশ্বাসে ভরা পুষ্প-গন্ধ,—
জাগালে চিত্ত তাহারি ঘায়।

দুপুরে তোমার রৌদ্র ঝরিছে,
হৃদয় আমার উদাস করে,
আকাশের দূর দিগন্ত ভরি'
এ কী ব্যথা তব ঝরিয়া পড়ে !

সন্ধ্যায় তুমি পশ্চিমাকাশে
ঢেলে দিয়ে গেলে গেরুয়া সুর,
মরণের মতো রাত্রি নামিল—
এক হ'য়ে গেল নিকট দূর।



মনিচিলা

কালো কাগজের চিঠি মেলে দিলে,
আলোর হরফে তাহাতে লেখা,
এ কী রোশ্‌নাই আজি তব দূত,
তুমিই কি মোরে ভুলাবে একা !

দূত কহে ডাকি'—মহাউৎসব,
আহ্বান তুমি একাই পেলে,
নিমন্ত্রণের চিঠি খানি শুধু
দিকে দিকে আমি দিয়েছি মেলে !

গেয়ানদাস বঘেলী



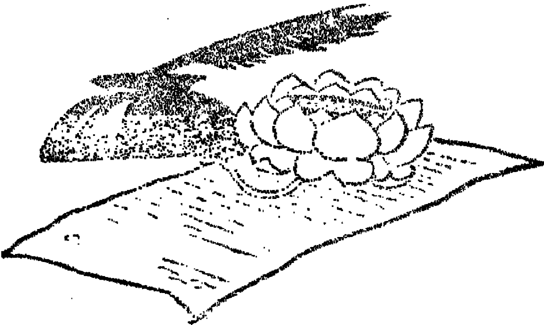


কৃপণের দুঃখ

কৃপণা কহে ডাকি' কৃপণ ওগো,
—আনন দেখি তব কি হেতু ম্লান ?
গাঁটের কড়ি কিছু হারিয়ে গেছে,
কোথাও কারে কিছু করেছ দান ?

কৃপণ কহে—না—না, যায় নি খোয়া,
দেওয়ার দুখ—তাও পাই নি আজ,
অপরে দিল শুধু দেখেছি আমি,
মাথায় ভেঙ্গে তাই পড়েছে বাজ।

অজ্ঞাত





নিদ্রোত্থিতা

তরুণীর ঘুম কেবলি ভেঙ্গেছে এই,
দেহে মনে তার তখনো আলস ঘোর,
ঘোমটা খসেছে—ভ্রূক্ষেপ তবু নেই,
মদেরও বেশী তার ও রূপের জোর।
কেশ এলায়েছে হীরক হারের পরে,
পায়ে পয়জার ঈষৎ দিতেছে উঁকি,
দাঁড়ায়েছে বালা নিরালা দরজা ধ'রে,
ভঙ্গি তাহার নয়ন নিয়েছে টুকি'।
এক হাত তার রহিয়াছে দরজায়,
আর এক হাতে গোলাপ-গুচ্ছ ভায়।

পদ্মাকর



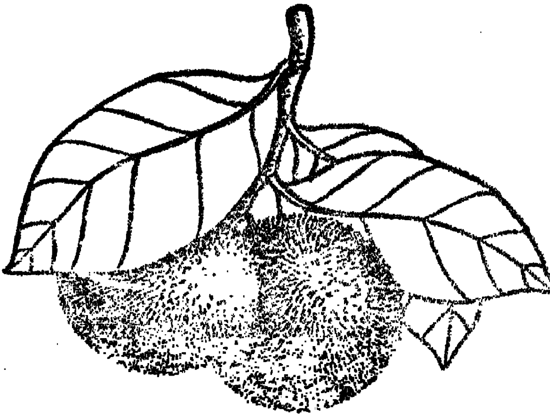


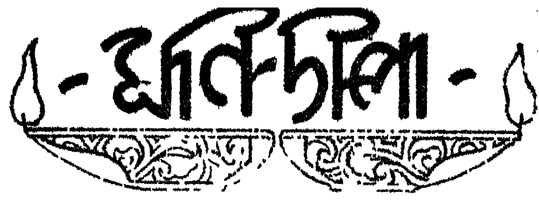
বর্ষায়

কুঞ্জের বুকে ভ্রমরের দল
মধুলোভে আজ মশ্‌গুল,
মন্দ সমীরে হিল্লোল আজি ছল-ছল্‌,
বর্ষা-রূপসী ভরিয়া তুলেছে
ক্ষীণা তটিনীর দুই কূল,
দাদুরীর দল—তারাও করিছে কোলাহল।

বন্ধু আসিবে—যুবতীরা তাই
সন্ধ্যারে চাহি' আনমন,
কালো জলদের বুক চিরে' ঝলে বিদ্যুৎ,
যেন পুষ্পের বৃষ্টি ঝরিছে
মেঘ হ'তে আজ অফুরণ,
পাতায় পাতায় আলো দোলে তারি অদ্ভুত।

পদ্মাকর





অনুদ্বিগ্না

সম্পদ নিয়ে গর্ব্ব করুক যা খুশী যার,
বন্ধুর প্রেম—সম্পদ আছে বক্ষে মোর,
প্রতি কণা তার ঝেড়ে মুছে' রাখি হাজারো বা'র,
হৃদয়ের মাঝে নিভৃতে সে আছে—রুদ্ধ দোর !

দুয়ারের চাবি—নাড়া-চাড়া তাও নিজেই করি,
আমি ছাড়া তাই কেহ নাহি তার খবরো জানে।
দিন চ'লে যায়—কভু না খোয়ায় একটি কড়ি,
জোয়ারের জল বাড়িয়া চলেছে বাড়ার টানে।

কভু বসন্ত অন্তর তলে জমায় ভিড়,
বর্ষার মেঘ ফণা তুলে' কভু ঘনায় কাছে,
বিচলিত তায় নয় এ হৃদয় রূপমতীর।—
মনের মিতা যে কাছে আছে তার—বুকেই আছে !

রূপমতী




বৈষ্ণব





বসন্তাগমে

মলয় সমীর সখি, আজি অতি সুকোমল
লবঙ্‌-লতায় ছুঁয়ে নিভৃতে,
কুঞ্জ-কুটীর-তল গুঞ্জিত অলি-দলে,
মুখরিত কোকিলের সুগীতে !

সরস বসন্তের সমাগমে হরি আজ
তরুণীর সনে কেলি-মগ্ন,
মধুমাস কি ভীষণ জানে শুধু তার মন
মিলনের আশা যার ভগ্ন।

প্রিয়া যার পথে পথে, মদনের নিপীড়নে
কাঁদে সেই অভাগিনী বধূরা,
ভ্রমরের ভিড় আজ ব্যাকুল বকুল তলে,
শাখা তার লাখো ফুলে মধুরা।





তমালের ডালে ডালে পল্লব অভিনব,
মৃগমদ-সুরভি সে সঙ্গে,
পলাশের দলগুলি—খর নখ মদনের
তরুণের হিয়া বিঁধে রঙ্গে।

ভুবনের রাজা আজ মদন—দণ্ড তার
বিকশিত বকুলের বেণীরে,
ভ্রমরের দলে ঢাকা পারুল কুসুম-দাম
গড়িয়া তুলিছে তার তূণীরে।

হাস্যে ভরিয়া দিক্ বিঁধিছে বিরহী-হিয়া
বর্শার ফলা ঐ কেতকী,
জগতের যত লাজ বিগলিত—তাই আজ
হাসে তরু ফুলে-ফলে এত কি!





নব মল্লিকা-দল, মালতীর পরিমল
বিঁধিছে বসন্তের তনুকে,
বিহ্বল মুনি-মন—বন্ধু যে তরুণের
মধুমাস সেই এলো সমুখে।

এলায়িত লতিকার আশ্লেষে পুলকিত
চূত হ'লো পূর্ণ যে মুকুলে,
নীল যমুনার জলে যুবতীর সনে হরি
বিহারে মেতেছে আজ গোকুলে!

জয়দেব



অনুনয়

কথাটি যদি কহগো প্রিয়ে, দন্ত-রুচি-জ্যোৎস্নায়
মিলায় ঘন তিমির-কুয়াশা,
চন্দ্র সম বদন তব লোভে নয়ন-চকোর ছায়,
জাগে অধর-সুধার পিয়াসা।

কোমল-হিয়া হে প্রিয়া মোর, রোষের তব কারণ নাই,
ছাড়িয়া মান এসো এ হিয়াতে,
মদন-জ্বালা বিকল করে তনু-মনের সকল ঠাঁই,
মুখের মধু দেহ গো পিয়াতে।

তবুও যদি না ভাঙে রোষ, হানো নিঠুর নয়ন-শর
বাঁধো কঠিন বাহুর শাসনে,
যা খুশী করো সুদতী অয়ি, ইচ্ছা যদি কঠোরতর
পীড়ন করো বিঁধিয়া দশনে।





তনুতে তুমি ভূষণ মম, জীবন সেও তুমি যে মোর,
রত্ন ভব-সাগর মাঝারে,
তাই তো চাহি দণ্ড-পল সকল ছাপি' প্রণয় তোর,—
নিয়ত চাহি হৃদয়ে তোমারে।

তন্বী, তব নয়ন দু'টি ছিল যা নীল কমল প্রায়
রক্তরাগে উঠেছে বিকশি',
নিমিষ হানি' রাঙ্গায়ে তোলো প্রেমানুরাগে কৃষ্ণ-কায়-
তাদের কাজ সেই তো রূপসী!

তোমার কুচ-কলস পরে টানিয়া দেহ মণির হার,
হৃদয়খানি ভরাও আলোকে,
জঘন পরে স্তনিত হোক্ মেখলাটার ঝনৎকার,
ঘোষুক তারা মদন-পুলকে!





পড়িছে ঝরি' কত না থল কমল তব চরণে গো,
আঁকিছে রেখা—হৃদয়-শিলাতে,
আদেশ করো তাদেরে ঢাকি অলক্তেরি বরণে গো,
সহায় যারা রভস-লীলাতে।

রতি-বিষের প্রতিষেধক উদার পদ-পল্লবেরে
রাখো আমার মাথায় হরষে,
মদন-দাহ দারুণ অতি কাতর তব বল্লভেরে
বাঁচাও প্রিয়া সরস পরশে।

জয়দেব





অভিসার

মদনেরো যে ভূষায় মোহ আসে—সাজি' তায়
অভিলষি' রভসের মধুগো,
হে গুরু নিতম্বিনী,—বিলম্ব ক'রো নাকো—
অভিসারে গেছে তব বঁধুগো !

সমীর বহিছে ধীর, নীল যমুনার তীর,
তারি মাঝে মিলনের কাননে,
তোমারি প্রতীক্ষায় বনমালী রয়েছে যে,
চলো সেথা—চলো স্মিত আননে।

সঙ্কেত করি' ঐ বাজায় তোমার নাম
কেশবের সুমধুর বেণুরে,
অঙ্গ-পরশ নিয়ে ছড়ায়ে পড়ে যে বায়ু
ধন্য মানিছে তারো রেণুরে।



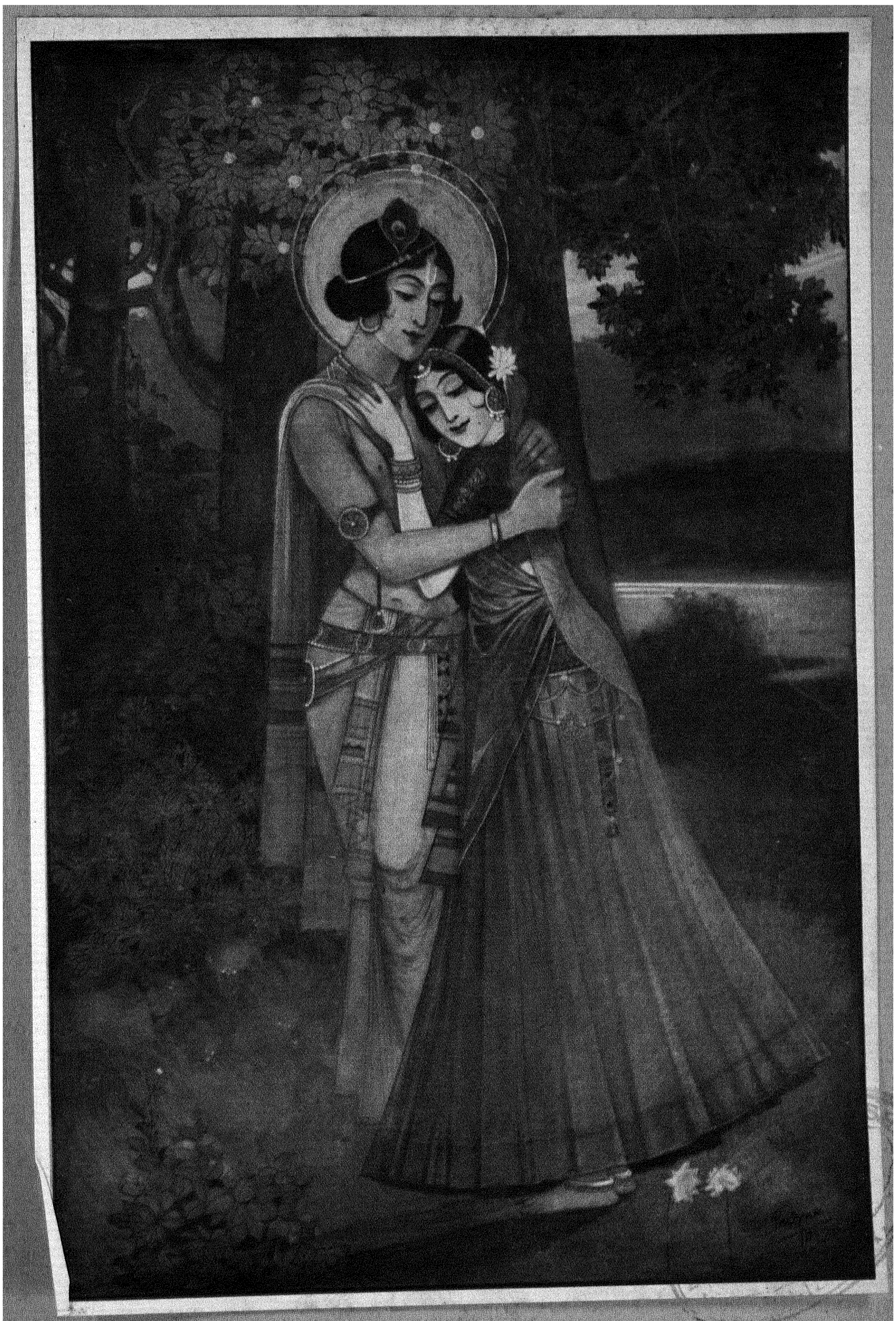
ঝিলিমিলি

হয়তো ঝরেছে পাতা, অথবা নড়েছে পাখী,
তুমি এলে ভাবি' ওঠে চমকি',
শয্যা-রচনা করে, চকিত নয়ন দু'টি
পথ-পানে চেয়ে থাকে থমকি'।

অধীর নূপুর ঐ ব্যাঘাত সে রভসের,
খুলে' দূরে ফেলে দাও তাহারে,
কুঞ্জ তিমিরে ছায়, চলগো জড়ায়ে গায়
ঘন নীল বসনের মায়ারে।

চঞ্চল বলাকার হারে ঘেরা জলদের
দেহে যথা নেচে ফেরে দামিনী,
মুক্তার মালা-ঘেরা বক্ষে ও মাধবের
শোভিবে তোমারো তনু ভামিনী।





মানিনী

পদ্ম-নয়না অয়ি, কিশলয় শয্যায়
টুটে' যাক্‌ বাস তব জঘনে,
মেখলাও যাক্‌ খ'সে—অঙ্গের সুষমায়
দোলাও বঁধুর হিয়া সঘনে।

অভিমানী প্রিয় তোর, নিভৃত রজনী সেও
পলে পলে মিলাইছে তূর্ণ,
প্রসাধন করো শেষ, বন্ধুর পাশে যাও—
মিলন-কামনা করো পূর্ণ।

জয়দেব





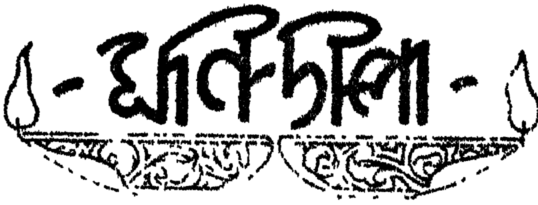
প্রহেলিকা

কণ্ঠেতে নীল কমল-মালা—নয় সে দ্যুতি গরলের,
বুক জুড়ে' হার দিচ্ছে দোলা—ও হার নহে ভুজঙ্গ,
ভস্ম কোথা ?—অঙ্গে মাখা গন্ধ-লেখা চন্দনের,
হর ভ্রমে এই বিরহীরে বাণ হেনো না অনঙ্গ !

চূত-শায়ক তূণেই রাখো—চাপ দিও না ধনুকে,
বিশ্ব-জয়ী, মূর্চ্ছাতুরে আঘাত নহে পৌরুষের,
মৃগাক্ষী তার দৃষ্টি-শরে বিঁধ্ল যাহার তনুকে,
কেউ কি চালায় তাহার পরে তীক্ষ্ণতর অস্ত্র ফের ?

প্রিয়ার ভুরু-পল্লবেতে জোড়া ধনুক স্পন্দে গো,
অপাঙ্গ—সে গুণটি টেনে বাণ হানিতে ব্যস্ত যে,
অনঙ্গ যে ত্রিভুবনে জয় করে এক দণ্ডে গো—
অস্ত্রগুলি ক'রে গেছে ঐ দেহেই কি ন্যস্ত সে !





দৃষ্টি-শায়ক—জানি হৃদয় বিঁধ্‌তে সে নয় অশক্ত,
কালো কুটিল কবরীটি করে করুক মর্ম্ম-ভেদ,
মোহ এনেও দিতে পারে বিম্বাধরের অলক্ত,—
সু-বৃত্ত ঐ স্তন যে তাহার আঘাত করে সেই তো খেদ!

স্নিগ্ধ সরস প্রিয়ার পরশ, চোখের তরল দৃষ্টি তার,
পঙ্কজেরি গন্ধ মুখের, কণ্ঠ-বীণার মূর্চ্ছনা,
রক্ত ঠোঁটের দীপ্তি—সবই জুড়ে' আছে মন আমার,
তবু কেন চিত্ত দহে বিচ্ছেদেরি যন্ত্রণা!

জয়দেব



প্রসাধন

হে বন্ধু, চন্দনে সুশীতল কর-পুট
রাখো তব মোর পীন বুকের পরে,
মদনের মঙ্গল-কলসী শোভিবে তাহে
মৃগমদ-চিহ্নিত পাতার থরে।

মন্মথ-বাণে ভরা ভ্রমরের মতো আঁখি,
কাজলের কালো রেখা শোভিত তায়,
অধরের চুম্বনে তাহারে মুছেছো তুমি,
টেনে দাও তারে ফের পক্ষ্ম-ছায়।

মনসিজ-পাশ যেন আমার এ শ্রুতি-মূল,
প্রান্তে হরিণ আঁখি হয়েছে শেষ,
সুন্দর কুণ্ডল তাহাতে রচিয়া দাও,
মুক্তা-খচিত করো শ্রবণ-দেশ।



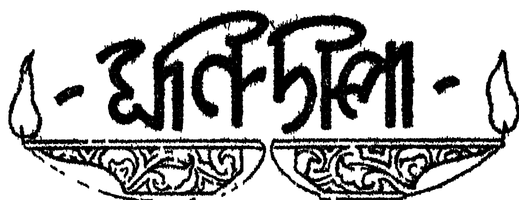


কমলের দল জিনি' বিকচ এ মুখ বঁধু,
এলায়েছে তাহে কালো কেশের থর,
প্রসাধন করো তার, নতুবা হে প্রিয় হের,
সখীরা হানিছে উপহাসের শর।

চন্দ্রের কলা এই ললাটের তট হ'তে
মুছে' ফেলে দাও স্বেদ-উৎস-ধার,
নিখুঁতে আঁকিয়া দেহ চাঁদের কলঙ্ক গো—
তিলকের রেখা—মৃগ-মদের সার।

কামের রথের চূড়ে সূক্ষ্ম চামর দোলে—
চিকুরের রাশি মোর তাহারি সম,
রভস-লীলার ভরে শিখিনী মেলেছে পাখা—
পুষ্পে সাজাও তারে হে প্রিয়তম!



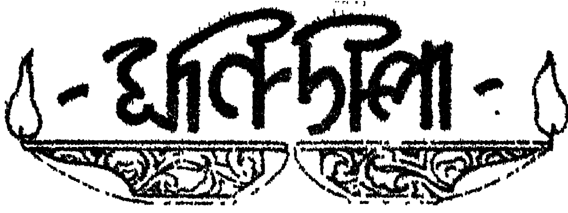


মদনের করিণীর বিপুল কাঁধের মতো
ঘন এ জঘন মম ভূষণ-হীন,
বসন আঁটিয়া দাও, মেখলা পরাও তায়,
মণির কাঞ্চি করো তাহাতে লীন।

হরির চরণ স্মরি' কবি জয়দেব রচে
জয়-গাথা—মুছে' দিতে কলির দুখ,
মর্ত্ত্যলোকের তাহা ভূষণ স্বরূপ হোক্,
সকলে শুনিতে হোক্ সমুৎসুক !

জয়দেব

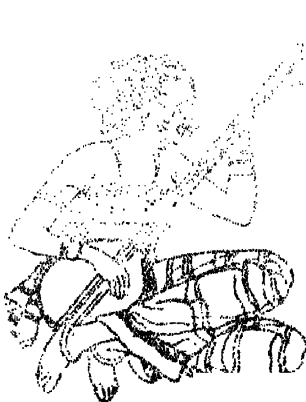




শুভ রাত্রি

আজি এ রজনী আমি আনন্দে পোহায়েছি
দেখিয়াছি পিয়া মুখ-চন্দ,
জীবন ও যৌবন সফল হ'য়েছে মোর,
দশ দিকে ঝরিছে আনন্দ।
আমার এ গৃহ আজি গৃহ বলি' মানিলাম,
সার্থক হ'লো মোর অঙ্গ,
আজি বিধি মোর প্রতি একান্ত অনুকূল,
সন্দেহ সব হ'লো ভঙ্গ।
লক্ষ কোকিল আজি করিতেছে কলরব,
লাখো শশী ঢালিতেছে হর্ষ,
মদনের পাঁচ বাণ আজিকে সংখ্যাহীন,
মলয় পবনে মধু স্পর্শ।
আমার এ দেহ আজি দেহ ব'লে মনে হয়,
প্রিয়ের পরশ-সুখ জন্য,
কহিছে বিদ্যাপতি— তুমিই ভাগ্যবতী,
নব এ প্রণয় তব ধন্য।

বিদ্যাপতি





প্রোষিত ভর্ত্তৃকা

সখি,

মাধব আসিবে কবে বল্ ?

বিশ্বাস নাহি হয় পারিব যে পার হ'তে

বিরহের পয়োধির জল।

এখন তখন করি' দিবস মিলায়ে গেল,

দিনে দিনে মাস হ'লো সায়,

মাস পর মাস গুণে' বরষো ফুরায়ে গেল

এ তনু মিলায়ে বুঝি যায়।

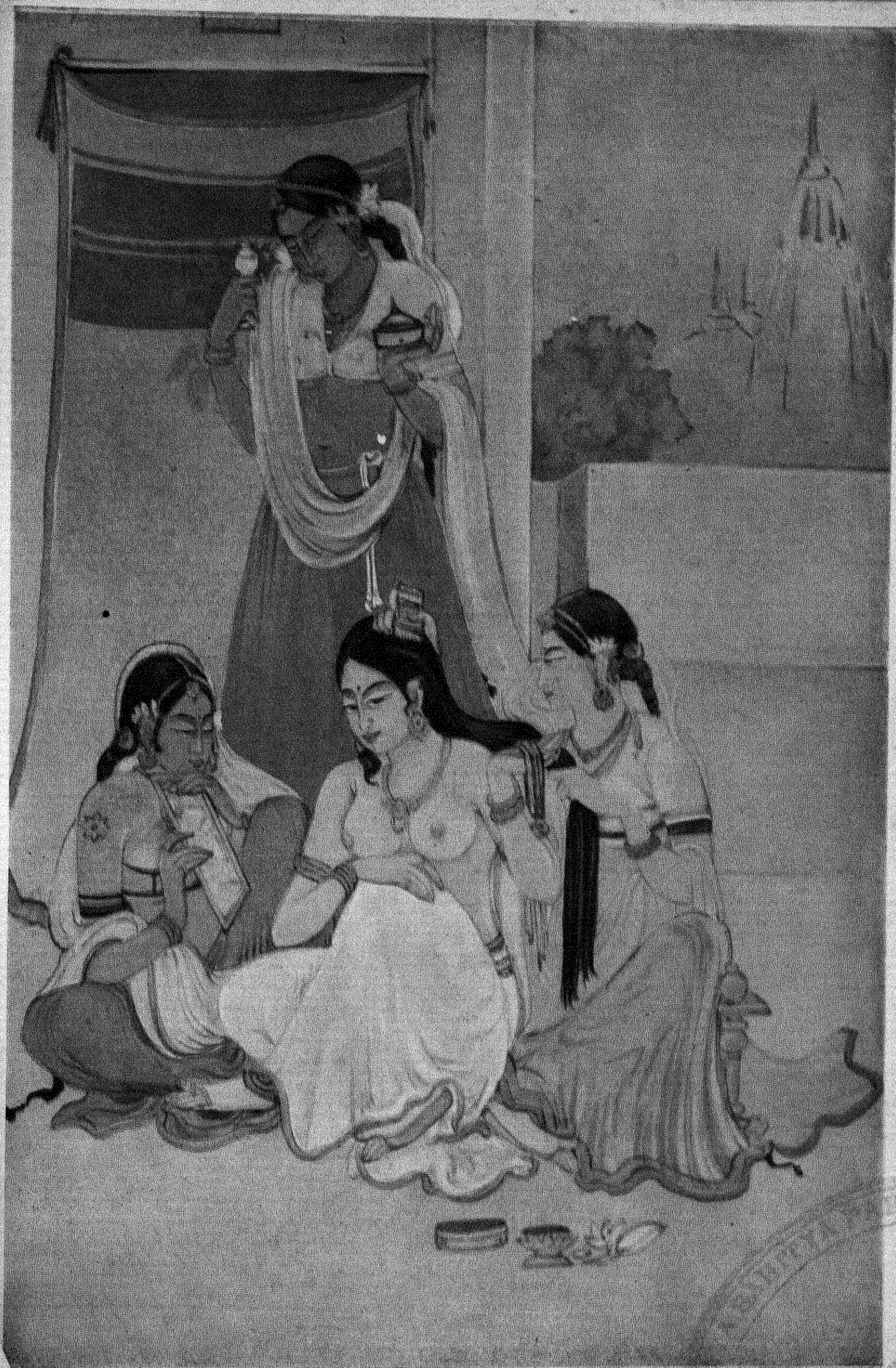
বরষের পর হায় বরষো মিলায়ে যায়,

জীবনের কোথা আর আশ ?

শিশিরের জ্যোৎস্নায় কমলই ঝরিল যদি,

কি হ'বে আসিলে মধু মাস !





মনদিলা

তপনের তাপে যদি কুঁড়িই শুকিয়ে গেল,
বরষা লাগিবে কোন্ কাজে ?
নব যৌবন যদি বিরহেই হয় ক্ষয়
বঁধুয়ার প্রেম কে বা যাচে ?
কহিছে বিদ্যাপতি— রূপসী তরুণী অয়ি,
বৃথা বহ নিরাশার ভার,
হৃদয়ের নিধি তব বন্ধু মিলিবে আসি,
মিলনেরো দেরী নাহি আর।

বিদ্যাপতি



রূপের উৎস

তনু দেহ-তল তার যেখানে প্রকাশ,
সেই খানে বিজলীর চমক-বিলাস।
অরুণ চরণ তার যেথা দিয়ে যায়,
থল কমলের দল ফুটিছে সেথায়।
সঙ্গিনী সাথে নিয়ে কোন্ ধনী তার,
কেলিতে মেতেছে সই, সঙ্গে আমার!
ভুরু-তলে জাগে যেই ভ্রূকুটির দোল,
ঝ'রে পড়ে যমুনার মন্দ হিলোল।
যেখানেতে পরে তার তরল নয়ন,
নীল উৎপল দলে ভ'রে উঠে বন।
যেথা যেথা সুমধুর হাস্য ছড়ায়,
কুন্দ-কুমুদ দল সেই খানে ছায়।
গোবিন্দদাস কহে—মুগ্ধ কানাই
রাইকে চিনেও হায় আজো চিনে নাই!

গোবিন্দদাস



বর্ষা-রাতে

ঘন নীল মেঘ-জালে আকাশ ভরা,
তিমিরে নিজেরো দেহ যায় না ধরা।
শ্যামের উজল মুখ হৃদয়ে জাগে,
অন্তর-সাগরেতে জোয়ার লাগে।
স্বজনি, বিচার করি' বুঝেছি মনে—
পেনু আজ অভিসার-শুভ-ক্ষণে।
মৃগমদে ঢেকে দেহ অঙ্গ খানি,
সুনীল নিচোল দেহ তাহাতে টানি'।
বৃথা কাঁচুলীতে নাহি কুচেরে ঢাকো,
সতীন মুক্তা-হারে তফাতে রাখো।
সখি, তুই মোর হ'য়ে আয় না দেখে—
ঘুমায়েছে সকলে কি রয়েছে জেগে।
পাছে দিক্ ভুল হয় আঁধার-তলে,
গোবিন্দদাস তাই সঙ্গে চলে।

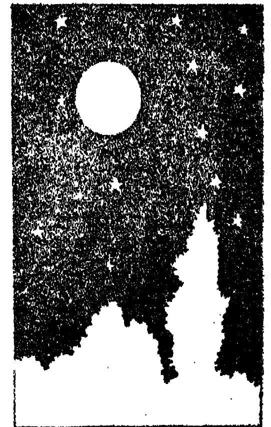
গোবিন্দদাস



অভিসার

পৌষের বিভাবরী ধীরে বহে বায়,
চৌদিকে হিমকর তুহিন ছড়ায়।
মন্দিরে থাকি' তবু কাঁপে তনু-তল,
শয্যায় ঢাকে চোখ্ ভয়-বিহ্বল।
চমকিয়া চেয়ে দেখি—এ কি বিস্ময়,
অভিসারে চলে রাই এম্নি সময়।
পরিহার করেছে সে শয্যার সুখ,
কাঁচুলী-বিহীন তার কুচ উন্মুখ।
গৌর তনুতে শুধু শুভ্র বসন,
অলক্ষ্যে চলে রাই কুঞ্জ-ভবন।
কোমল চরণে দলে তীক্ষ্ণ তুহিন,
কণ্টক-বাট তবু শঙ্কা-বিহীন!
গোবিন্দদাস কহে—বিঘ্ন-পাথার
প্রণয়-বিমুগ্ধ যে, কি করিবে তার?

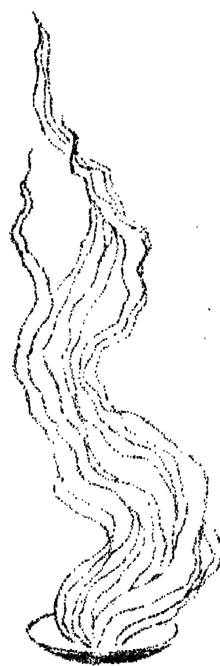
গোবিন্দদাস



বিরহে

তীক্ষ্ণ শরের শয্যা হ'লো ফুলের শয়ন আজ,
মধুকরের গুঞ্জরণে ঝরিয়া পড়ে বাজ।
পদ্মদলের গাঁথা মালায় সাপ সে শিহরায়,
মলয় বায়ু উগারিছে বিষের জ্বালা হায়!
হায় ওরে হায় কেহই নহে আমার অনুকূল,
এম্‌নি ক'রেই আমার হিয়া পেলো প্রেমের মূল!
কর্‌ব কি যে, কোথায় যাবো পাই নে তারো থই,
আমার বুকের গোপন কথা—তাই বা কারে কই?
এই দেহটায় কেমন ক'রে জীবন বলো রয়,
বাসর-শয়ন—সেই বুঝি আজ মরণ-গেহ হয়!

ঘনশ্যাম দাস

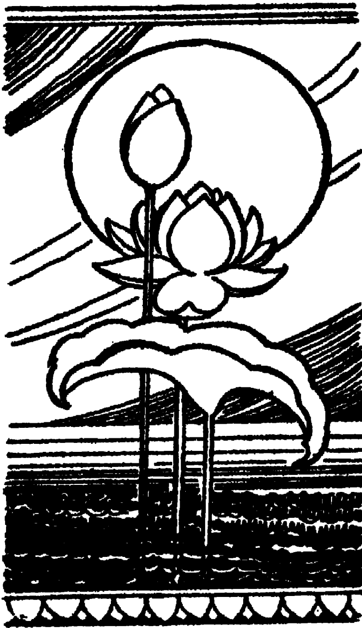


খণ্ডিতা

গগনে গরজে মেঘ, রাত্রি আঁধার—
কুঞ্জে রচিছে শেয সুন্দরী তার।
অন্তরে বন্ধুর মিলন সে চায়,
নানা আভরণ আনি' অঙ্গ সাজায়।
তাম্বুল-কর্পূর-গন্ধের ভার,
চন্দন-বিলেপন, পুষ্পের হার।
কত আশা-নিরাশায় মন ভরপূর,
আসে না—আসে না তবু বঁধু নিঠুর!

জ্ঞানদাস





বিবিধ



আত্ম-নিবেদন

অজস্র ফুল,—দুর্লভ ফুলে আর
অতি অপরূপ যে মালা গড়িয়া উঠে,
জানি—জানি তাহা নহে তব কামনার,
তোমার খুশীর ভ্রমর সেথা না লুটে।

তুমি চাও মালা সেই ফুল দিয়ে গড়া,
ছন্দের সুর যে ফুল ফুটায়ে যায়,
মুগ্ধ হৃদয় যার মাঝে পড়ে ধরা,
ফুল হ'য়ে ফুটে প্রেমের বন্দনায়।

ভক্ত কেবল সে মালা গাঁথিতে পারে,
সে পাবে কোথায় সাধনা যাহার নাই?
তাই গাঁথি মালা অশ্রু-মুক্তা-ভারে,
ব'য়ে আনি শুধু বিগলিত বেদনাই।

হে প্রভু, তবু এ তোমারি স্তুতির গান,
নিখিল মনের কামনা তুমিই জানো,
গান গেয়ে গেয়ে হোক্ দিন অবসান,
এই ভাবে মোরে তোমার নিকটে টানো।

তাম্রমানবর



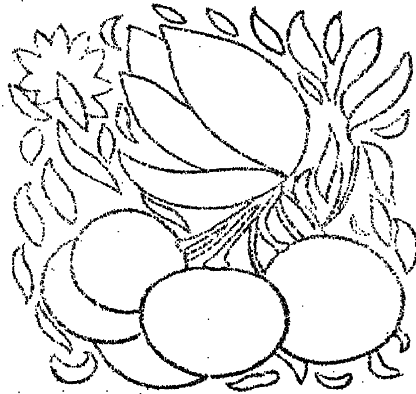


ব্যাকুলতা

গগন ছেপে আলো ঝরায় রবি,
আলোয় দোলে পাপ্‌ড়ি যে পদ্মের—
হে প্রভু মোর, তোমার আলোকেতে,
দলগুলি মোর ফুটাও জীবনের।

আকাশ ঘিরে' মেঘের দোলা আজি,
মেঘের পানে চেয়ে ময়ূর নাচে,
নটরাজের নৃত্য দেখার লাগি',
চিত্ত আমার ময়ূর হ'য়ে আছে।

আব্‌ছা হাসি—মায়াপুরীর মায়া—
চকোর কেঁদে যাচে চাঁদের আলো,
আলোর বাণী পোঁছে দিলে যদি,
প্রভু, তোমার দীপ-শিখাটি জ্বালো।



ধানদীপা

পাড়ের বাধা ছাপিয়ে উঠে সাগর—
আমার বুকে তারি জোয়ার জাগে,
অশ্রু-ধারার ক্ষ্যাপা প্লাবন এ যে—
বাঁধ্ ভেঙেছি তোমার অনুরাগে !

ধূপের দেহ পুড়িয়া জ্বলে দীপ,
নিভাতে তার শিখায় নারে বায়,
আত্মা আমার শিখায় ভরিয়াছি—
আমার প্রভু, কোথায় তুমি হায় !

দিনের আলোয় উজল যখন ধরা,
মাটির প্রদীপ কেউ কি জ্বালে আর ?
তুমি যদি পরশটুকু দাও,
কোথায় থাকে মনের আঁধিয়ার !

তায়ুমানবর





কর্ম্মের ফল

জন্ম নিয়েছি কে জানে কত না স্থানে,
ধরণীর যত জানা ও অজানা দেশে,
কত নাম ছিল কেই বা সে কথা জানে,
সাজানু নিজেরে কত না চিহ্নে—বেশে !
কত জন হ'লো বন্ধু—স্বজন—মিতা,
পাপের দেহ এ ধরেছি হাজার বারও,
কর্ম্মের ফল ফলিছে মিঠা ও তিতা,
কর্ম্ম কে জানে কত কি ঘটাবে আরও !

তায়ুমানবর





আমার প্রিয়া

ও দোলন চাঁপা, জানি—আমি জানি
পেলব তোমার হিয়া,
তোমার চেয়েও পেলব যে জন
সে জন আমার প্রিয়া !
ফুল দেখে মিছে হ'য়ো না বিকল,
দুর্ব্বল রে হৃদয়,
সকলেরি পানে চেয়ে থাকে ফুল—
প্রিয়ার আঁখি ও নয় !

লতার মতন বাহুটি প্রিয়ার,
কচি পল্লব—কায়,
নিঃশ্বাসে তার মদির গন্ধ,
হাসি ভরা মুক্তায় ।



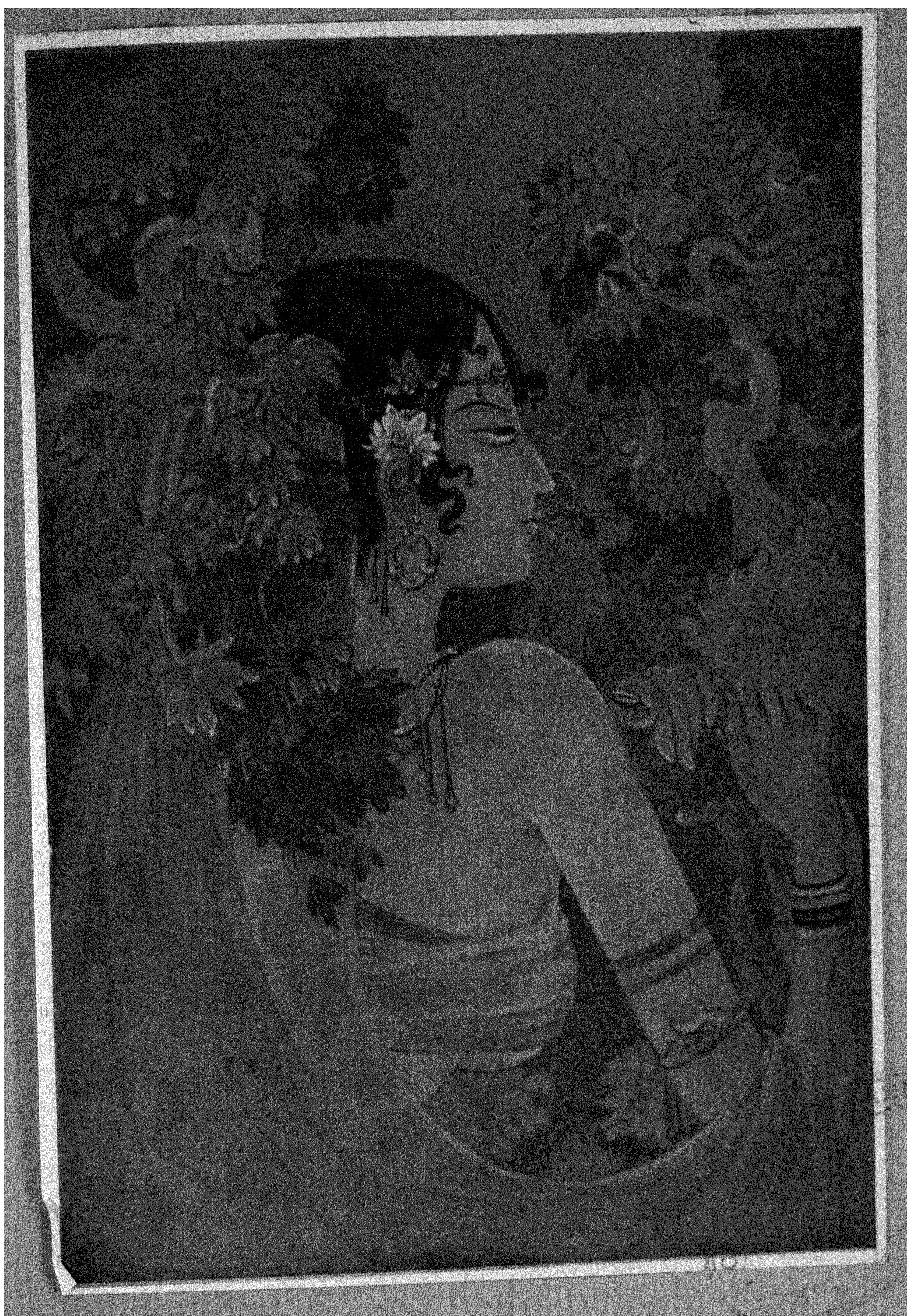
- ঘনি-চিলা -

নয়নের তার নীরব চাহনি
যেন গো তীক্ষ্ণ বাণ,
মরমের মাঝে নিমিষে পশিয়া
মন ক'রে আনচান।

আকাশের নীল—তারো চেয়ে গাঢ়
আমার প্রিয়ার চোখ,
তার পানে চেয়ে মাথা না নোয়ায়
কে আছে এমন লোক !
প্রিয়ার ভূষণ ফুলে ভরিয়াছে,
কাঁটাও রয়েছে ফুলে,
ক্ষীণ কটি বুঝি ভারে ভেঙে পড়ে—
ঘন ঘন উঠে দুলে'।

গগনের চাঁদ নীচে কি নেমেছে ?—
ভেবে দিশা নাহি পায়,
পথে যেতে যেতে আকাশের তারা
তাই বুঝি ঝ'রে যায়।



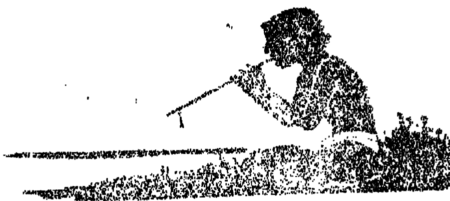


ঝিলিমিলি

দিশা-হারা তারা এ যে তোমাদের
মিছে ভুল করা ভাই,
দিনে দিনে বাড়ে তোমাদের চাঁদ,
বাড়া-কমা এর নাই।

চাঁদের আননে অত রূপ নাই,
প্রিয়ার মুখে যা আছে,
তাই তো বিকায় চিত্ত আমার
জ্যোৎস্না-লেখার কাছে।
ফুলের মতন ও আঁখির আলো
চাঁদ যদি পেতে চায়,
আমারি দুয়ারে নিতি এসে যেন
ধরণা সে দিয়ে যায়।

তরুবল্লুবর



উচ্ছ্বাস

দৃষ্টি এবং বাণী এবং স্পর্শ এবং গন্ধ,
আলো আছে যত রকম—যত রকম ছন্দ,
সব মিলিয়ে তৈরী হ'লো আমার প্রিয়ার মূর্ত্তি,
হাতে যাহার সোনার বালা—অঙ্গে কালো কুর্ত্তি।

ব্যাধি যাহা জড়ায় দেহ—মনরে করে ক্ষিণ্ন,
তাহারে যে আরাম করে রোগ হ'তে সে ভিন্ন,
দুখের পাথার মনের মাঝে যা ক'রে ও সৃষ্টি,
দূর করারও শক্তি রাখে তারেও ওরই দৃষ্টি।

পদ্ম দোলে আঁখির তলে আনন্দে ঐ দেব্‌তার—
তাঁরা যেথায় নিবাস করেন সুখ সেখানে এনৃতার।
প্রিয়ায় ছাড়ি' যে খুসী চা'ক্ আনন্দের সেই স্বর্গ,
প্রিয়ার দু'টি কোমল বাহুই আমার চতুর্বর্গ।



- মনি-চিলা -

দূরে গেলে জ্বালায় জ্বলে মনের আদ্যোপান্ত,
কাছে এলেই সকল জ্বালা এক নিমিষে শান্ত।
আগুন—এ যে কিসের আগুন কোত্থেকে যে পায় সে—
কিছুই তাহার বুঝি নাকো—ঘোর প্রহেলিকাই এ!

পুষ্প দোলে প্রিয়ার কেশে, দোলে ফুলের গুচ্ছ,
যাদু জানে প্রিয়া আমার—নয় সে যাদু তুচ্ছ।
চায় যে নিধি চিত্ত আমার, মাগে যে ধন মন গো,
প্রিয়ার মাঝে সবই আছে—তোরা সবাই শোন্ গো!

দীর্ঘ সবল ঐ যে দু'টি প্রিয়ার আমার হস্ত—
চা'র ধারেতে আছে ওরই সুধার ধারা ন্যস্ত।
তাই তো যখন ঐ হাতেরি স্পর্শ লাগে অঙ্গে,
মরা অনু-পরমাণুও জীইয়ে ওঠে রঙ্গে।

দানের বহর চলে যাহার উদয় হ'তে অস্ত,
দিয়ে থুয়ে আহার করে যে উদার গৃহস্থ,
আদর তাহার গভীর যেমন—কেউ ক'রো না সন্দ—
তেমনি মিঠে আমার প্রিয়ার আলিঙ্গনের ছন্দ.



পরস্পরের বাহুর তলে বক্ষ মেলে হর্ষে,
হিয়ার সাথে হিয়া মিলায় নিবিড় ঘন স্পর্শে।
ঘন নিবিড় সেই যে পরশ—জমাট কি সে বল্‌ব,
প্রবেশ পথও পায় না বায়ু—মিথ্যাতে না ছল্‌ব।

আশ্লেষ তাহার তনু-লতার ভ্রূকুটি তার চক্ষের,
সারা হৃদয়-দ্রব-করা দোলানি সে বক্ষের—
এই গুলিরই চা'র ধারেতে ঘুরে' বেড়ায় নিত্য,
মধু লোভে ভ্রমর সম মুগ্ধ মম চিত্ত।

দৈন্য মনের কোন্ খানেতে যেই পারা যায় ধর্‌তে,
জ্ঞানের আলো ছল্‌কে উঠে' মর্ম্ম থাকে ভর্‌তে।
পূর্ণ হ'য়ে ওঠে যত পঙ্গু প্রেমের অঙ্গ,
ততই আমি নিবিড় ক'রে পাই যে প্রিয়ার সঙ্গ।

তিরুবল্লুবর





প্রেম-মুগ্ধা

বঁধু আমার চোখের কোলে আছেই চিরদিন—
রইবে সেথায় তারার মাঝে লীন।
পলক যদি পড়ে চোখে—আঘাত নাহি লাগে,
হাল্‌কা বঁধু চোখের তারায় জাগে।

বঁধু আমার চোখের আলোর মধ্যে করে বাস—
তাই ছেড়েছি কাজল পরার আশ।
একটি পলও তারে ছেড়ে আমার চলা দায়,
এমন হ'লে কাজল পরা যায়!

দিনে রাতে একটি বারও হয় না বোঁজা চোখ্—
চ'লে গেলে সইবে না তার শোক।
গাঁয়ের লোকে অতন্দ্রিতার রকম দেখে কয়—
বঁধুর আমার নাইরে—নাই হৃদয়!

মনের মাঝে হৃদয় যেথা—সেথায় বঁধু শোয়,
প্রতি অনু ভালোবাসায় থোয়।
পাড়ার লোকে বুঝ্‌তে নারে বন্ধু কোথায় আছে
তারা ভাবে—আমায় ভুলিয়াছে!

তিরুবল্লুবর





বেপরোয়া

মোরা নহি কারো রায়ত কিম্বা প্রজা,
মৃত্যুরে মোরা থোরাই কেয়ার করি,
নরকে কখনো ব'বো না ব্যথার বোঝা,
নহি দুর্ব্বল—তাই তো ডরি না অরি।

আনন্দ আছে আমাদের মন জুড়ে',
কাহারো চরণে কভু না নোয়াই শির,
খুশী ভরা বুকে দুনিয়া বেড়াই ঘুরে,'
পাছে প'ড়ে থাকে সব দুঃখের ভিড়।

কেবল কাহারো শাসন ছোঁয় না যারে,
পরম প্রভু যে—আমরা তারেই মানি,
হৃদয় মোদের বিকায়ে দিয়েছি তারে,
সেথা নাই কোনো দৈন্য কিম্বা গ্লানি।

অম্বর



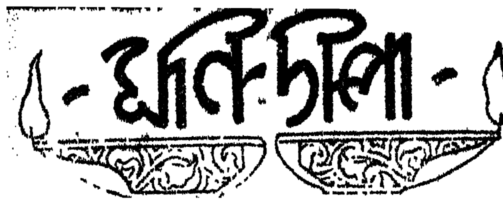


আমার বোঝা

নূপুর যেমন ঝন্‌ঝনিয়ে বাজে—
দিগ্বিদিকে বাজে তোমার নাম,
মানব-হৃদয় ক্ষুধায় ভ'রে আছে—
তুমি পূরাও সবার মনস্কাম।
তুমিই প্রভু, বইছ তোমার ঘাড়ে
এই জগতের যত রকম ভার,
আমার ব্যথা—অত বোঝার ধারে
ভার বাড়াবে কতটুকুই আর!

নামদেব





দেহের মাঝে

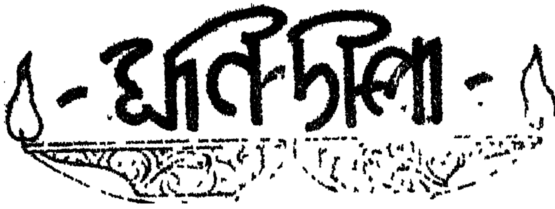
প্রভু আছেন দেহের মাঝে জেগে দিবস-রাতি,
তাঁরে খুঁজে' বেড়াস্ শত ঠাঁই,
দেহের মাঝেই আছেন তিনি চিরদিনের সাথী,
তোরে ভুলায় তীর্থেরি রোশ্‌নাই।

সব জীবেরই দেহের মাঝে তিনি ফেরেন নেচে,
আখের মধু আখ্ ছাড়া কি রয়?
নাভির মাঝে গন্ধ থাকে, তবু তারেই যেচে
অবোধ মৃগ ঘোরে কাননময়।

ননী রহে দুধের মাঝেই—এমন লোকও আছে
তুলে' নিতে তাও জানে না হায়,
তুকা কহে—দয়াল প্রভু দেহের মাঝেই রাজে,
মূর্খ মানুষ দুনিয়া হাত্‌ড়ায়!

তুকারাম





নীতির নিয়ম

পানের লাগি' পেলে জলের কণা,
নিয়ো তুমি অন্ন-দানের ব্রত,
মিষ্টি কথা ভাগ্যে যদি জোটে,
মাথাটারে ধুলোয় ক'রো নত।
কড়ির দেনা পরিশোধের বেলা
সোনার মোহর—তারেই ক'রো দান,
জীবন যদি বাঁচিয়ে থাকে কেহ,
পরের লাগি' সঁপিয়ে দিয়ো প্রাণ।

জ্ঞানী যারা এই রকমেই তারা
কথা কহে, কাজের ধারা জানে,
ছোট সেবাও দেয় ফিরিয়ে তারা,
হাজার গুণে বাড়িয়ে তারে আনে।
কিন্তু যারা জ্ঞানীর বাড়া—মহান্‌,
তাদের আবার নেইকো আপন পরও,
অপরাধের ঋণ তাহারা শোধে
উপকারের অর্ঘ্য করি' জড়।

গুজরাটী নীতিকথা





বিদায়ের গান

হায় অতিথি, চাইছ বিদায়—সহজ বলো বিদায় দেওয়া ?
ফিরে যদি এসো আবার দেখা দিও ফের তখন,—
আবার দেখা আমায় দিয়ো,
বিয়োগ-ব্যথার ছুঃখ বড়—বইলে বুকে প্রেমের হাওয়া
চিড়্ খেয়ে যায় এক নিমিষেই বিদায়-ব্যথায় হৃদয়-মন।
—আবার এসো—বক্ষে নিয়ো।

ফুল—সে ঝ'রে মিলিয়ে গেছে—পাপ্‌ড়ি প'ড়ে রইল আজ,
বিয়োগ-ব্যথা ফুলরে ঝরায় আমায় দেখে স্বীকার ক'রো—
আবার দেখা আমায় দিয়ো।
পূজারতির ফাঁকে ফাঁকে রইল যাহা ত্রুটির লাজ,
দিল-দরিয়ার অতল তলেই তার সমাধির কবর গ'ড়ো—
আবার এসো—বক্ষে নিয়ো !

গুজরাটী গান





গানের ধূয়ো ধর্‌বি আয়

গানের ধূয়ো ধর্‌বি আয়—নৌকা দোলায় দীঘির জল,
মস্ত দীঘি উছ্‌লে ওঠে—সাগর সম নেইকো তল।
পাগল হরষ বুলায় তুলি,
একলা আমি ছল্‌কে দুলি,
সোনার মেঘে টোপায় ফোঁটা—মুক্তা ঝরায় মেঘের দল।

রসিক সখি, দেখ্‌রে চেয়ে রস-ভেজা মোর হৃদয় এই,
কম্‌লা রঙের চাদরখানি—তাও যেরে মোর শুক্‌নো নেই।
রঙ্‌ লেগেছে জগৎ ভ'রে,
উছ্‌লে দীঘি উপ্‌চে পড়ে,
আয় নেমে আয় নীল সলিলে—ধর্‌বি গানের ধূয়োর খেই।

গুজরাটী গান



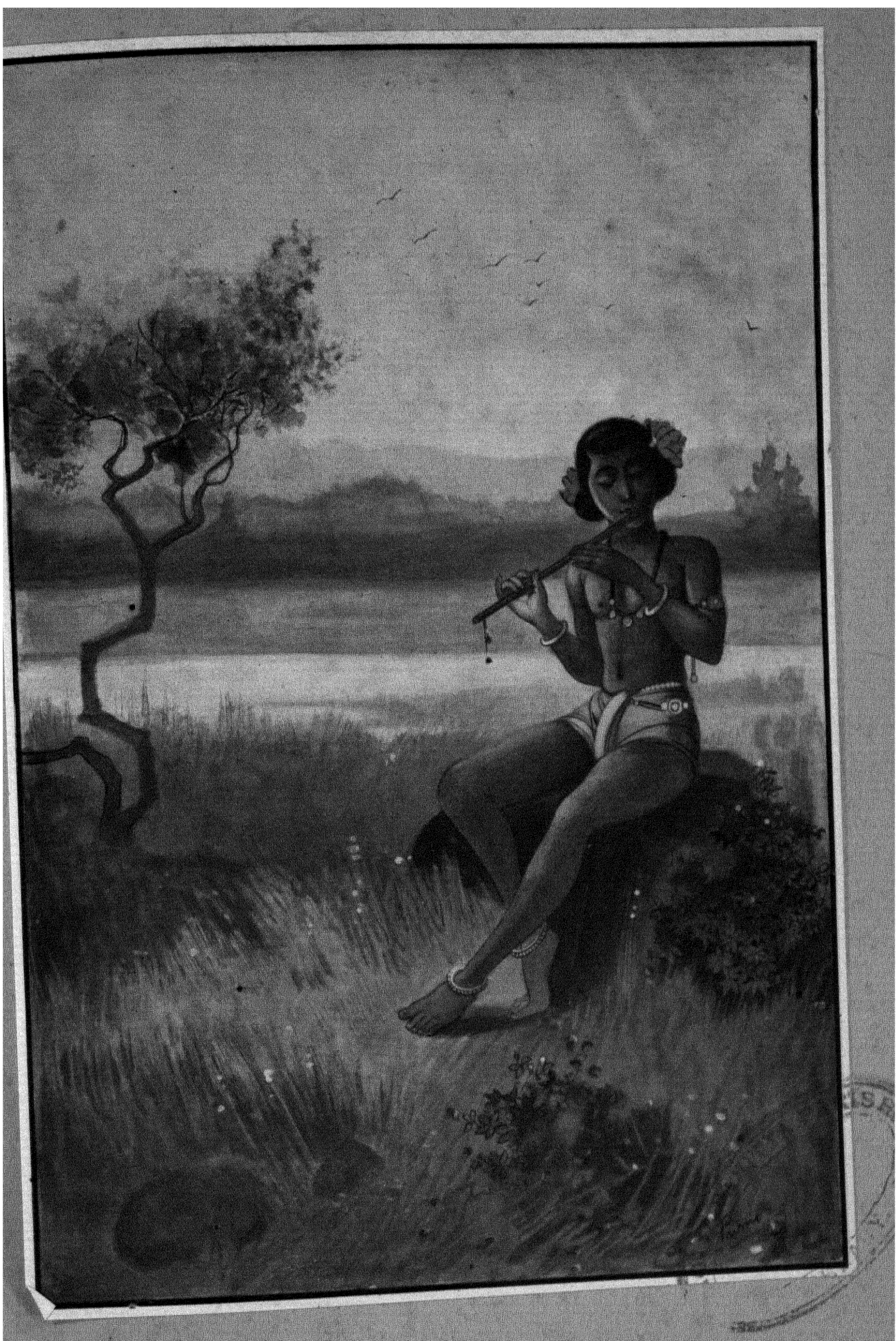


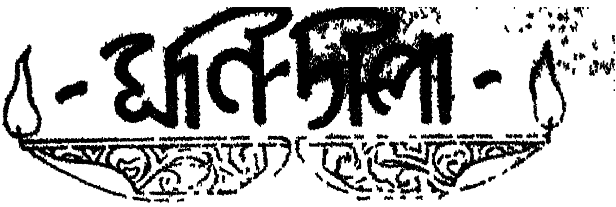
মহুয়ার নেশা

দেশ-ভরা মহুয়ার কত আছে গাছ,
মহুয়া—সে দিন ভর্ ঝ'রে ঝ'রে পড়্ছে,
হিংসুটে বাতাসটা—নেই তার লাজ,
অলস ও রোদ্দুরো আঙিনাটা ভর্ছে।
বঁধুয়ারে, মহুয়ায় না কুড়ুলে আজ,
তার চেয়ে মিঠে সুর বাঁশীতেই ঝর্ছে।

সাঁওতালী গান







আঁধার রাতের ভয়

জ্যোৎস্না রাতে যখন শু'তে
ও ননদী, বাইরে,
কেউ করে নি তখন তাতে আপত্তি,
আজ রজনী নিঝুম কালো,
চাঁদের আলোও নাইরে,
বাইরে শোয়ায় তাই রয়েছে বিপত্তি।

বইছে হাওয়া বেপরোয়া—
কন্‌কনে ও স্যাঁৎসেতে,
ঘুমও তোমার আজ বসেছে চোখ জুড়ি',
টপ্‌কে বেড়া ঢুক্‌বে চোর,
পাশেই আছে ওৎ পেতে,
গয়না গুলো যাবে তোমার সব চুরি!

সাঁওতালী গান





কথার ফের

কথায় কথায় কথা বেড়ে গেল হায়,
লোকের ফোড়ন পড়িল তাহারি গায়,
ভিন্ হ'য়ে গেনু আচম্‌কা খেয়ালেই।
বন্ধু আমার, বছর না হ'তে ওর,
তোমার লিখন কাছে যেন আসে মোর,
বিরহের ব্যথা তোমারো কি বুকে নেই!

*

বন্ধুর মোর ছিল যে সোনার সাজ,
পোষাকে তাহার ছিল যে রূপোর কাজ,
তারে ভোলা যায়?—কি ক'রে তাহারে ভুলি?
তেতুলের গাছ আকাশ গিয়েছে ছুঁয়ে,
পোষাক গুলোরে তারি পরে এনু থুয়ে,
ঝাঁট্ দিতে ভুলি—উঠানে জমিছে ধূলি!

সাঁওতালী গান





চেনা চোর

ঘরের প্রদীপ কে নিবালে,
মিশ্ কালো কি আঁধার রে !
আৎকে ভয়ে উঠ্‌ছে বুক,
ননদী, তুই কোথায় রে ?
আঁধার রাতের আঁচল খসে—
ঠাকুরঝি, তুই কোথায় হায়,
দোর হ'তে কার আওয়াজ আসে,
দেখ্ কে ঘরে ঢুকতে চায় !

চোর যে এসে ঢুক্‌ছে ঘরে,
হায় তরাসে কাঁপ্‌ছে গাও,
দাদা যে তোর নেই বাড়ীতে,
ও কেমনে জান্‌লে তাও ?
ননদী, তুই কোথায় ওরে,
নিশাস বুকে থাম্‌ছে যে,
ঢুক্‌লে ঘরে ছ্যাঁচোড় চোর—
আমার পানেই আস্‌ছে সে।





চোর এসেছে সত্যি ক'রেই,
ও ননদী, আয় ছুটে,'
ঠোঁটে আমার খায় যে চুমো,
হায় কী পাজি—বিদ্‌ঘুটে !
ও ঠাকুরঝি, আয়রে ছুটে',
আর দেরি তুই করিস্ নে,
ঘরে আমার চোর ঢুকেছে,
সর্ব্বনাশ আর বাড়াস্ নে।

আকাশেতে চম্‌কে দেয়া,
চিড়্ খেয়ে যায় নভের বুক,
ও ননদী—ও ননদী,
এ যে চেনা চোরের মুখ।
এখন তুই আর নেই বা এলি,
আর আঁধারের নেইকো ভয়,
একাই আমি পার্‌ব এরে
সাম্‌লে নিতে যদিই হয় !

সাঁওতালী গান

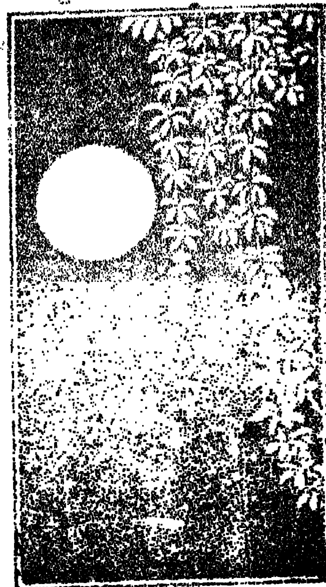


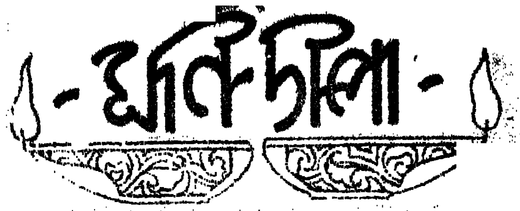


জ্যোৎস্না রাতে

“মোর নেইকো সম-বয়সী মেয়ে—
তাই কুমার হ’য়েই রইনু হায়,
আমি বেরিয়ে যাবো আজই চলে
আর রইব না এ দেশের ছায়।”
“বঁধু তাও কি গো হয়—তাও কি গো হয়,
আজ বিদেশ যাওয়ার দিনই যে নয়!
দেখো জ্যোৎস্নাতে আজ বান ডেকেছে,
শুধু রূপা ঝরে রাতের গায়।”
“তবে ভার ছেড়ে দেই রাতের হাতেই—
যদি সঙ্গিনীটি সেই জোটায়!”

সাঁওতালী গান





তোর্ষা নদীর ধারে

তোর্ষা নদীর ধারে দিদি, মনসাই নদীর পারে
সোনার বঁধু গান গেয়ে যায়—যায় সে অভিসারে।
তোর পানে ও চায় কি দিদি, মোর পানে ও চায় ?—
কান পেতে শোন্, সোনার বঁধু গান গেয়ে ঐ যায়।

বড় বহিন ঢেঁকি পাড়ায়, ছোট বহিন ঝাড়ে,
গাঙ্ গড়িছে মেজো বহিন দুই নয়নের ধারে—
চোখের জলের ধারা দিয়ে গাঙ্ যে গড়ি' হায়,
তোর পানে ও চায় কি দিদি, মোর পানে ও চায় !

যায় চ'লে আর পিছন পানে তাকায় থাকি' থাকি',
ও দিদি, ও যায় যে চ'লে, কেমন ক'রে ডাকি ?
যায় ছড়িয়ে তুষের আগুন মনের আঙিনায়।
তোর পানে ও চায় কি দিদি, মোর পানে ও চায় !

কোচদের গান







মার্জ্জনা

অজ্ঞতা আর অহমিকা হ'তে
যে ভুল করেছি আমি,
নম্র হৃদয়ে তোমারে না মেনে
যে ভুল হয়েছে স্বামী,
তোমার ধ্যানের ধারণা ভুলিয়া,
ভুলি' তব উপাসনা,
যে ভুল করেছি—সব ভুল হ'তে
করো মোরে মার্জ্জনা।

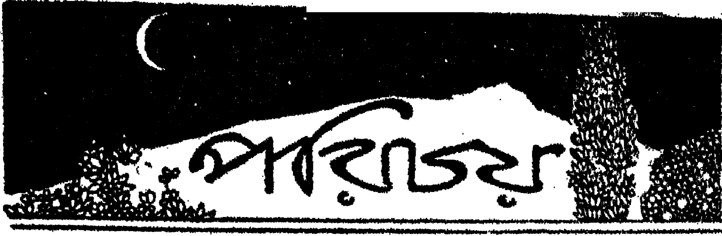
❋

বাক্যের পাপ, চিন্তার পাপ,
যে পাপ করেছি কাজে,
দৃষ্টির দোষে, শাস্ত্র হেলায়
যে পাপ বর্ত্তিয়াছে,
সকল পাপের মার্জ্জনা করো—
সেবক ভিক্ষা যাচে।

পট্টিনত্তার







অথর্ব্ব বেদ—যজ্ঞের তন্ত্রধারকদিগকে অথর্ব্বা বলিত। এই অথর্ব্বাদের দ্বারা যে বেদ রচিত হইয়াছে তাহাই অথর্ব্ব বেদ। চারি বেদের ভিতর ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা অর্ব্বাচীন। সম্ভবতঃ ঋগ্বেদের সর্ব্বশেষ মণ্ডল অর্থাৎ দশম মণ্ডল রচনার পরে এই বেদ-রচনা আরম্ভ হয়। ইহার রচয়িতা সিন্ধু-তীরবাসী সৈন্ধবগণ, অথর্ব্ব অঙ্গিরা এবং ভৃগু-ঋষির বংশধরগণ। ইহার ৭৬০টি সূক্তে ৬০০০ শ্লোক আছে। মন্ত্রগুলির অধিকাংশই তুক্‌তাক্‌, অভিচার, বশীকরণ, ব্যাধির প্রতিকার প্রভৃতি ব্যাপার লইয়া রচিত। তবে মাঝে মাঝে উচ্চাঙ্গের আধ্যাত্মিক ভাবের মন্ত্রের সাক্ষাৎও ইহার ভিতরে পাওয়া যায়।

অপ্পর—প্রাচীন তামিল কবিদের অনেকেরই জন্মের তারিখ পাওয়া যায় না। অপ্পরের জন্মের তারিখও তেমনি কালের অন্ধকারে হারাইয়া গিয়াছে। সম্ভবতঃ তিনি খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কুদ্দালোর জেলার একটি ক্ষুদ্র গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি শৈব ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। কথিত আছে—অপ্পর সব সময় লাঙ্গলের ফলার মতো একটি যন্ত্র সঙ্গে রাখিতেন এবং তাহার দ্বারা যখনই কোনো দেব-মন্দিরে যাইতেন তাহার আবর্জ্জনা পরিষ্কার করিয়া দিতেন। এইরূপে তাঁহার দেহ দেব-সেবার কাজে মন এবং বাক্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিত। অপ্পর প্রায় ৩০০ কবিতা রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রার্থনা মূর্ত্তি-দেবতার উদ্দেশ্যে রচিত হইলেও তাহার ভিতর দিয়া অনাদি ঈশ্বরের কল্পনাও ধরা পড়ে।

অমরু—বিরহ, মিলন, প্রতীক্ষা, প্রণয়ের কলহ ইত্যাদি প্রেমের নানা রকমের খেয়ালই তাঁহার কবিতার উপাদান। প্রত্যেকটি কবিতা চা'র লাইনের এক একটি শ্লোকে শেষ হইয়াছে। স্থান অল্প—কেবল চা'রটি পংক্তি মাত্র। কিন্তু তাহার ভিতরেই ভাবের যে দীপ্তি ধরা পড়িয়াছে তাহা অপরূপ। অমরুর অধিকাংশ শ্লোকই একটা সহজ সরল আন্তরিকতার স্পর্শে সরস ও সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে, যদিও কৃত্রিম ও আড়ষ্ট রসিকতার পরিচয়ও মাঝে মাঝে পাওয়া যায়। অনেকে মনে করেন—অমরু বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের এক রত্ন ছিলেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে জোর করিয়া কোনো কথা বলা চলে—এরূপ প্রমাণের একান্ত অভাব। তবে তিনি যে খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের পরে জন্মগ্রহণ করেন নাই তাহা একরূপ নিঃসংশয়েই বলা যায়।

উদ্ভট—"গ্রন্থ-বহির্ভূত কিন্তু বহুল-প্রচলিত কবিতা বা শ্লোক।" সংস্কৃতে এরূপ বহু শ্লোক আছে যাহার রচয়িতার নাম জানা যায় না, অথচ যাহার লোক-প্রসিদ্ধি আছে। এই সমস্ত শ্লোকের ভিতর মাঝে মাঝে দুর্লভ কবিত্বেরও সন্ধান পাওয়া যায়।

ঋগ্বেদ—বিশ্ব-সাহিত্যের প্রাচীনতম গ্রন্থ। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের কাহারও কাহারও মতে ঋগ্বেদ অন্ততঃ ৩৫০০ বৎসরের পুরাতন। কিন্তু বাল-গঙ্গাধর তিলক, জাকোবী প্রভৃতি মনীষীরা বলেন—ইহার বয়স ৫০০০ বৎসরের কম নয়। হিন্দুদের মতে বেদ অনাদি ও অপৌরুষেয়। ইহার রচয়িতা ছিলেন মন্ত্র-দ্রষ্টা ঋষিরা। ঋগ্বেদে মোট ১০১৭টি সূক্ত স্থান পাইয়াছে। প্রকৃতির শক্তিকে দেবতা কল্পনা করিয়া লইয়া সূক্তগুলি রচিত হয়। আর্য্যদের ধর্ম্মানুভূতির অভিব্যক্তি হইলেও ইহার স্থানে স্থানে যে কবিত্ব আছে তাহা অতুলনীয়। খ্রীষ্টের জন্মের অত পূর্ব্বেও ভারতবর্ষের সভ্যতা যে কত বড় একটা পূর্ণতা এবং বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছিল, ঋগ্বেদের এই সূক্তগুলিই তাহার প্রমাণ।

কথা-সরিৎ-সাগর—কাশ্মীর কবি সোমদেবের রচনা। এই বৃহৎ গল্প-গ্রন্থে ২২,০০০ শ্লোক আছে। গ্রন্থখানি ১২৪টি তরঙ্গে (অধ্যায়ে) বিভক্ত। গল্পগুলি অধিকাংশই রূপকথা জাতীয়। ইহার উপাদান গুণাঢ্যের 'বৃহৎ কথা' হইতে গৃহীত। রচনা ভঙ্গি সরল, সবল ও হৃদয়-গ্রাহী। গ্রন্থখানি খ্রীষ্টীয় ১০৬৩—১০৮৮ সালের ভিতর রচিত।

কবীর—চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জাতিতে মুসলমান ছিলেন। কেহ কেহ বলেন—তিনি মুসলমানের দ্বারা পালিত মাত্র। গৃহী-সন্ন্যাসী বলিতে যাহা বুঝায় কবীর ছিলেন তাহাই। জীবিকার্জ্জনের জন্য তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন জোলার ব্যবসা। কবীরের কাছে ব্রহ্ম কাল্পনিক বস্তুমাত্র নহেন, তাঁহার কাছে 'তিনি একেবারে প্রত্যক্ষ সত্য। সমস্ত জগৎ তাঁহার রূপ। পৃথিবীর যত কিছু বৈচিত্র্য সমস্তই সেই অরূপের লীলা।' গোরক্ষনাথ, নানক, চৈতন্য প্রভৃতি ভারতের ধর্ম্ম-গুরুরা তাঁহার সমসাময়িক লোক। সাম্প্রদায়িকতার প্রতি তাঁহার অত্যন্ত বিদ্বেষ ছিল। তাই হিন্দু এবং মুসলমান ধর্ম্মের মধ্যে যেখানে তিনি যে গলদ পাইয়াছেন তাহাই আক্রমণ করিয়াছেন। কেবল ভক্তির দিক দিয়া নহে, কবিত্বের দিক দিয়াও হিন্দী-সাহিত্যে কবীরের প্রতিদ্বন্দ্বী দুই একজনের বেশী পাওয়া যায় না।

কালিকা পুরাণ—প্রাচীন আর্য্য-পন্থীদের কাছে বেদের যে মূল্য, হিন্দুধর্ম্মের পরবর্ত্তী বিভাগ হইতে উৎপন্ন যে সব সম্প্রদায় তাহাদের কাছে, অর্থাৎ শৈব, বৈষ্ণব, শাক্ত প্রভৃতির কাছে পুরাণের মূল্য কতকটা সেই রকমের। পুরাণের মূলও বৈদিক সাহিত্যে। কলিকা পুরাণ ঠিক পুরাণ নহে, ইহা উপ-পুরাণের অন্তর্ভুক্ত। পুরাণ ও উপপুরাণগুলির ভিতর মূলগত পার্থক্য খুব বেশী নাই, কেবল উপপুরাণগুলিতে সাধারণতঃ আলোচনা করা হইয়াছে কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের বা স্থানের ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে। কালিকা পুরাণ কালীর হাজারো রকমের বিভিন্ন মূর্ত্তির এবং পূজা-পদ্ধতির পরিচয়ে পরিপূর্ণ। ইহার একটি অধ্যায়ে রাজ-নীতির আলোচনাও দেখিতে পাওয়া যায়।

কালিদাস—সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যের মুকুট-মণি। ইঁহার প্রতিভা কাব্য, নাটক, গীতি-কবিতা—এক কথায় রস-সাহিত্যের সমস্ত ক্ষেত্রেই অনন্য-সাধারণ। রঘুবংশের ন্যায় মহাকাব্য, মেঘদূতের ন্যায় গীতি-কবিতা এবং শকুন্তলার ন্যায় নাটক জগতের যে কোনো সাহিত্যে দুর্লভ বস্তু। সংস্কৃত সাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি হইলেও ইঁহার আবির্ভাবের সময় লইয়া মতদ্বৈধের অন্ত নাই। ভারতের প্রবাদ-কথা ইঁহাকে বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের একজন মনে করিয়া খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে স্থান দিয়াছে। মোক্ষমুলার প্রমুখ পণ্ডিতেরা এই প্রবাদ ঐতিহাসিক সত্য বলিয়াই মনে করেন। কিন্তু পরবর্ত্তী পণ্ডিতদের আলোচনায় এ ধারণা যে ভুল তাহা প্রায় নিশ্চিতরূপেই ধরা পড়িয়াছে। কালিদাসের নিজের কাব্যের ভিতর হইতে যে সব প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহাতে কেবল এই কথাই বলা যায় যে, তিনি খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতক হইতে পঞ্চম শতকের ভিতর কোনো এক সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বাহিরের কতকগুলি প্রমাণও এই মতেরই সমর্থন করে।

গোবিন্দদাস—বঘেলখণ্ডের ভক্ত কবি। জীবনের ইতিহাস বিশেষ কিছু জানা যায় না, তবে কবিতার ভিতর দিয়া তাঁহার হৃদয়ের ইতিহাস ধরা পড়ে। বিচারের কষ্টিপাথরে তাঁহার কবিতা খাঁটি সোনা বলিয়াই উৎরাইয়া যায়। তাঁহার কল্পনার ভিতরে যেমন চিন্তাশীলতার ছাপ আছে, প্রকাশ-ভঙ্গির ভিতর তেমনি আছে ওস্তাদ শিল্পীর পাকা হাতের পরিচয়।

গোবিন্দদাস—১৫২৭ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীখণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। পদাবলী সাহিত্যে তাঁহার স্থান চণ্ডীদাস এবং বিদ্যাপতির পরেই। সংস্কৃত ভাষাতেও তাঁহার রচিত নাটক ও কাব্য আছে। গোবিন্দদাসের রচনায় বিদ্যাপতির প্রভাব বিদ্যমান। কিন্তু তাহা হইলেও গোবিন্দদাসের ভিতর মৌলিকতার পরিচয়ও যথেষ্ট আছে। তাঁহার রচনার সাধারণ সুর বিদ্যাপতির রচনার সুর হইতে পবিত্র। কবিত্ব হিসাবে গোবিন্দদাসের স্থান বিদ্যাপতির নীচে হইলেও খুব বেশী নীচে যে নহে তাহাতে সন্দেহ নাই।

ঘনশ্যামদাস—প্রসিদ্ধ পদ-কর্ত্তা গোবিন্দ কবিরাজের পৌত্র। বৈষ্ণব পদাবলীর ভিতর ঘনশ্যামদাসের উল্লেখযোগ্য স্থান আছে। তাঁহার অনেক কবিতায় সত্যকার রস-সৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়।

জয়দেব—বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের পুত্র। বীরভূম জেলায় অজয় নদীর তীরে কেন্দুবিল্ব গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম ভোজদেব, মাতার নাম বামাদেবী এবং পত্নীর নাম পদ্মাবতী। কেহ কেহ বলেন—জয়দেব দুই বিবাহ করিয়াছিলেন। তিনি গৌড়ের রাজা লক্ষ্মণসেনের সভা-কবি ছিলেন। সুতরাং তিনি খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর লোক। 'গীত-গোবিন্দ' জয়দেবের অমর কীর্ত্তি। এ গ্রন্থের ছন্দের ঝঙ্কার ও শব্দের লালিত্য সংস্কৃত সাহিত্যেও অতুলনীয়। অনেক বৈষ্ণব কবিই ভাবের জন্য, ছন্দের জন্য, সুরের জন্য জয়দেবের নিকট ঋণী।

জ্ঞানদাস—জ্ঞানদাসের সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্য খুব কম পাওয়া যায়। তিনি ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কাটোয়ার দশ মাইল পশ্চিমে কাঁদড়া গ্রামে তাঁহার জন্ম। পদাবলী সাহিত্যে জ্ঞানদাস যে সুরের ঝঙ্কার তুলিয়াছিলেন তাহা কানের ভিতর দিয়া মর্ম্মও স্পর্শ করে। ভাষাতে আড়ম্বর নাই—একটা স্বাভাবিক ঋজুতা এবং সবলতা আছে। চণ্ডীদাসের প্রভাব তাঁহার উপর অল্প নহে। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার রচনা চণ্ডীদাসের অন্ধ অনুকরণও নহে। যে রস মানুষের নিবিড়তম অনুভূতির বিষয়, জ্ঞানদাসের রচনার বহুস্থানে তাহার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

তায়ুমানবর—অষ্টাদশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন। এই তামিল কবিটি ত্রিচিনপল্লির কোনো চোলা-রাজ-সরকারের কর্ম্ম-সচিব ছিলেন। তাঁহার বিবাহিত জীবন অত্যন্ত সুখের ছিল। স্ত্রীর মৃত্যুর পরে তাঁহার মন বৈরাগ্যে ভরিয়া যায় এবং সংসারের সঙ্গে তাঁহার সব সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া যায়, তিনি একান্তভাবে ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করেন। কাব্য-লক্ষ্মীর বীণা তাঁহার হাতে অত্যন্ত মিঠা সুরে বাজিয়াছে। সে সুর তামিল চিত্তকে একেবারে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া ফেলে।

তুকারাম—১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে পুণার কাছে দেহু নামক পল্লীতে তুকারামের জন্ম হয়। তিনি জাতিতে শূদ্র ছিলেন। একদিকে দারিদ্র্য এবং অন্যদিকে ব্রাহ্মণের পীড়ন পদে পদে তুকারামকে নিপীড়িত করিয়াছে। সে নিপীড়ন অমানুষিক। কিন্তু তুকার সহিষ্ণুতা ছিল অসীম, ভগবানের উপর নির্ভরতা ছিল অপরিমেয়। তাই এত দুঃখও তাঁহাকে কখনো পথ-ভ্রষ্ট করিতে পারে নাই। তাঁহার রচিত পদাবলীর নাম 'অভঙ্গ'। এই 'অভঙ্গ'গুলি প্রাচীন মহারাষ্ট্র-সাহিত্যের একটি প্রধান সম্পদ। তাঁহার রচিত 'অভঙ্গে'র সংখ্যা প্রায় ৪,৬০০টি। তুকারাম লিখিয়াছেন প্রচুর এবং তাহার ভিতর ভালো জিনিষের সংখ্যাও অল্প নহে।

তিরুবল্লুবর—তামিল কবি। জন্মের সন, তারিখ, বংশ সম্বন্ধে নিশ্চিতরূপে কিছু জানা যায় না। তবে তিরুবল্লুবরের সম্বন্ধে অনেক রকম কিম্বদন্তী আছে। সেই সমস্তর ভিতর হইতে তাঁহার মোটামুটি একটি ইতিহাস গড়িয়া তোলা যায়। সম্ভবতঃ তিনি মাদুরাতে জন্মগ্রহণ করেন। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতক হইতে তৃতীয় শতকের কোনো এক সময়ে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা ছিলেন ব্রাহ্মণ, মাতা ছিলেন পারিয়া। জীবিকার্জ্জনের জন্য তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁতির ব্যবসা। তিরুবল্লুবর মানে বল্লুব জাতির সেবক। সেই সব জাতির লোকই বল্লুব নামে খ্যাত যাহারা হাতীর পিঠে চড়িয়া রাজার আদেশ ঘোষণা করিয়া বেড়ায়। এই পরিগৃহীত নামটি ছাড়া কবির নিজের নামটি পর্য্যন্ত কালের অন্ধকারে হারাইয়া গিয়াছে। তিরুবল্লুবরের কবি-প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী ছিল। ধর্ম্ম, সমাজ, রাজনীতি, প্রেম—জীবনের নানা জটিল সমস্যার জটই তিনি খুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং রসের অপূর্ব্বতায় একান্ত নীরস ও শুষ্ক জিনিষও তাঁহার হাতে অপরূপ মাধুর্য্যে

ভরিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার কবিতা তামিল-ভাষা-ভাষীদের কাছে 'তামিল বেদ' নামে পরিচিত। তিরুবল্লুবরের কবিতা ফরাসী, জার্ম্মান, ইংরাজী প্রভৃতি নানা ভাষায় ভাষান্তরিত হইয়াছে।

তুলসীদাস—তুলসীদাস হিন্দী-সাহিত্য-গগনের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র। ১৫৩৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। প্রবাদ আছে—তুলসীদাস গঙ্গার জলে ভাসিয়া যাইতেছিলেন এমনি সময় মহাত্মা নরহর দাস তাঁহাকে উদ্ধার করেন। বারাণসীতে এই মহাত্মার পদপ্রান্তে বসিয়াই তুলসীর শিক্ষা ও সাধনা সমাপ্ত হয়। তুলসীদাসের রামায়ণ হিন্দীতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পঠিত গ্রন্থ। নর-নারী গভীর শ্রদ্ধার সহিত তাহা পাঠ করে। ইহার ছন্দের সুর যেমন সুমধুর, ইহার ভিতর দিয়া ভক্তির প্রবাহও তেমনি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। হিন্দী ভাষার এই রামায়ণখানি বাল্মীকির রামায়ণের অনুবাদ নহে—তুলসীদাসের কল্পনার সৃষ্টি এক অপূর্ব্ব বস্তু। রামায়ণ ছাড়াও আরো অনেক কবিতা তুলসীদাস লিখিয়া গিয়াছেন। তুলসীদাস বড় কবি, কিন্তু কবির চেয়েও তিনি বড় ভক্ত।

দাদুদয়াল—গুজরাটের আহ্‌মেদাবাদে ১৬০১ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার প্রকৃত নাম জানা যায় নাই। মানুষের প্রতি তাঁহার প্রেম ও ভালোবাসা এতই গভীর ছিল যে, সকলের কাছে তিনি দাদু ও দয়াল নামেই পরিচিত ছিলেন। এই ভালোবাসা-লব্ধ নামের তলেই তাঁহার আদত নাম হারাইয়া গিয়াছে। তরুণ বয়সেই সত্যের অনুসন্ধানে তিনি জন্মভূমি ত্যাগ করেন। শোনা যায়—এক অজ্ঞাত পুরুষ অকস্মাৎ অবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে দীক্ষা দান করিয়াছিলেন। রাজপুতনা, মাড়োয়ার, পঞ্জাব এবং গুজরাটের নানা স্থানে দাদু-পন্থী লোক ছড়াইয়া আছে। তাঁহার রচনা সহজ, সরল—ভক্তির সাবলীল উচ্ছ্বাসে মধুর ও স্নিগ্ধ।

নানক—১৪৬৯ খ্রীষ্টাব্দে লাহোর জেলায় নানকের জন্ম। গুরু নানক শিখ ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি দেশে দেশে ঘুরিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিতেন। 'জপজী' নানকের রচিত প্রাত্যহিক উপাসনা-গ্রন্থ। নানক এবং কবীর—সে যুগের এই দুই মহাপুরুষের ভিতর সাক্ষাৎ হয়, নানকের বয়স যখন ২৭ বৎসর। নানকের পরবর্ত্তী জীবনে কবীরের প্রভাব সামান্য নয়। কবি হিসাবে কবীরের স্থান নানকের ঢের উপরে। কিন্তু উভয়ের চিন্তা-ধারার ভিতরে একটা সামঞ্জস্য আছে। কবীরের মতোই তাঁহার ভিতরেও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও বৈষম্য দূর করার একটা চেষ্টা ছিল। 'মণি-দীপা'য় নানকের যে কবিতাটির অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে তাহা রচিত হয় পুরীধামে জগন্নাথ দেবের মন্দিরে। নানক তন্ময়ভাবে আরতি দেখিতেছিলেন। তাই আরতির সময় যে দাঁড়াইতে হয় সে খেয়াল তাঁহার ছিল না। পাণ্ডারা এজন্য তাঁহার প্রতি দোষারোপ করিলে তিনি এই বন্দনা-গীতি রচনা করিয়া বিশ্বপতির আরাধনা করিয়াছিলেন। শিখেরা প্রতিদিন প্রাতঃকালে এই সঙ্গীত গান করিয়া বিশ্ব-দেবের আরতি করেন।

নামদেব—মহারাষ্ট্রের সাতারা জেলার ভক্ত-কবি। তাঁহার জীবন-কথা রহস্য-তিমিরে আবৃত। কেহ কেহ বলেন—জীবনের গোড়া হইতেই তাঁহার ভিতর ধর্ম্মের অনুভূতি অত্যন্ত প্রবল ছিল। কীর্ত্তন প্রভৃতি লইয়াই তিনি মাতিয়া থাকিতেন। আবার কেহ কেহ বলেন—প্রথম যৌবনে তিনি অত্যন্ত অসংযমী ও দুর্দ্দান্ত ছিলেন। কোনো কাজই তাঁহার পক্ষে গর্হিত ছিল না। একবার একটি লোককে হত্যা করায় তাহার স্ত্রীর শোক-বিহ্বলতা তাঁহার জীবনের গতি ফিরাইয়া দেয়। তিনি আত্মহত্যার দ্বারা পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য 'নাগ-নাথে'র মন্দিরে গমন করেন এবং সেই খানে ভগবানের অনুগ্রহ লাভ করেন। নামদেবের 'অভঙ্গতে' তাঁহার চিন্তা-ধারার ক্রমোন্নতির পরিচয় সুস্পষ্ট। গোড়ায় তাঁহার কবিতা কেবল ভাবাবেগের উচ্ছ্বাস মাত্র ছিল—তাহাতে অশ্রুর চিহ্ন যতটা ছিল সে অনুপাতে চিন্তার গভীরতার ছাপ ছিল না। কিন্তু ধীরে ধীরে উচ্ছ্বাস মরিয়া যায়—তাঁহার আবেগ দার্শনিকতার কোঠায় আসিয়া দাঁড়ায়। 'বিঠোবার' মূর্ত্তি একদিন যাহা তাঁহার একমাত্র উপাসনার বস্তু ছিল, ক্রমে ক্রমে তাহাই তাঁহার কাছে বিশ্ব-দেবতার প্রতীক হইয়া উঠে। মহারাষ্ট্র-সাহিত্যে নামদেব শ্রেষ্ঠতম কবিদের অন্যতম।

পাট্টিনত্তার—সম্ভবতঃ দশম শতাব্দীর লোক। তিনি ধনী বণিক ছিলেন। তাঁহার জীবনের পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে একটি চমৎকার কাহিনী আছে। কাহিনীটি এই—একবার একজন সন্ন্যাসী তাঁহার গৃহে ভিক্ষার্থী হ'ন। পট্টি-নত্তার কেবল ধনীই ছিলেন না, অত্যন্ত কৃপণও ছিলেন। স্বামীর এই স্বভাবের কথা মনে করিয়াই পত্নী সন্ন্যাসীকে ভিক্ষা না দিয়া অপেক্ষা করিতে বলেন। বহুক্ষণ অপেক্ষা করার পরেও গৃহ-স্বামী ফিরিয়া না আসায় সন্ন্যাসী চলিয়া যান এবং যাইবার সময় বলিয়া যান—"অসৎ উপায়ে অর্জ্জিত অর্থ ও কৃপণের গুপ্ত ধন ছিদ্রহীন সুচের মতো। তাহা কাহারো কোনো কাজে লাগে না।" এই বার্ত্তায় তাঁহার মনে বৈরাগ্যের উদয় হয় এবং তিনি গৃহ ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হ'ন। তাঁহার কবিতার ভিতরে দুঃখের সুর অত্যন্ত তীব্র। নারীর প্রতি তাঁহার একটা প্রবল ঘৃণা ছিল। কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহার বীণায় ভক্তির গান অত্যন্ত মিঠা সুরেই বাজিয়াছে। তামিল মনের উপর তাঁহার প্রভাব সামান্য নহে।

পদ্মাকর—দৌলতরাম সিন্ধিয়ার সমসাময়িক লোক। তাঁহার পিতা মোহনলাল ভট্টও কবি ছিলেন। 'আলিজাহ প্রকাশ' নামে হিন্দী কাব্য লিখিয়া পদ্মাকর সিন্ধিয়ার নিকট হইতে লক্ষ মুদ্রা পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া শোনা যায়। হিন্দী সাহিত্যে পদ্মাকর শ্রেষ্ঠ কবিদের অন্যতম। প্রেমের কবিতা ও বীর-রসের কবিতা রচনায় তাঁহার সমান দক্ষতা ছিল। কবিতার ভিতর দিয়া তিনি চমৎকার ছবি আঁকিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার প্রধান বিশেষত্ব ছিল শব্দ-চয়নে। সুন্দর শব্দের মোহে অনেক স্থলে ভাবকে পঙ্গু করিতেও তিনি দ্বিধা করেন নাই।

পলটুদাস—অযোধ্যার নংগা জালালপুর গ্রামে পলটুদাসের জন্ম। অযোধ্যায় তখন নবাব সুজা-উ-দ্দৌলার রাজত্ব চলিতেছিল। ইনি কবীর প্রভৃতির মতোই গৃহী-সন্ন্যাসী ছিলেন। পলটুর সততা অনেককে তাঁহার প্রতি বিদ্বিষ্ট করিয়া তোলে। নিন্দা ও লাঞ্ছনা তাঁহার ভাগ্যে প্রচুর জুটিয়াছে, কিন্তু নিন্দুক বা শত্রুর প্রতি তাঁহার কোনো রকমের বিদ্বেষ ছিল না। ধর্ম্ম-সাধন সম্বন্ধে তাঁহার উপদেশ অতি মধুর। কবিতার ভিতর দিয়া তিনি যে প্রেমের ছবি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন তাহাও অন্তরের অন্তরতম প্রদেশকে স্পর্শ করে। কেহ কেহ তাঁহাকে দ্বিতীয় কবীর বলেন।

বিদ্যাপতি—চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মহারাজ শিব সিংহের সভা-পণ্ডিত ছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল। উক্ত ভাষায় তিনি অনেকগুলি কাব্যও রচনা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার পদাবলীই তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। পদাবলী সাহিত্যে একমাত্র চণ্ডীদাস ছাড়া তাঁহার সমকক্ষ আর কেহই নাই। তাঁহার রচনা অলঙ্কার-বহুল—উপমার ভারে অনেক স্থলে অতিরিক্ত রকমে ভারি। কিন্তু দুই চারিটি শব্দের সংযোগে ছবি আঁকিবার শক্তি তাঁহার অনন্য সাধারণ। পাণ্ডিত্যের সহিত আন্তরিকতা মিশিয়া তাঁহার বহু পদকে অক্ষয় সৌন্দর্য্য দান করিয়াছে। বিদ্যাপতি ঠাকুর দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়াছিলেন।

বৌদ্ধ থেরীগাথা—থেরীগাথা বৌদ্ধ-বেদ বা 'ত্রিপিটকে'র অন্তর্গত। থেরী বলিতে স্থবিরা বা জ্ঞান-বৃদ্ধা বুঝায়। প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। ইহাতে সেইরূপ ৭৩ জন রমণীর রচনা ও জীবন-কাহিনী স্থান পাইয়াছে যাঁহারা সাক্ষাৎভাবে বুদ্ধের সংশ্রবে আসিয়াছিলেন। থেরী গাথা হইতে আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বের ভারতীয় নারীদের সামাজিক অবস্থা, তাহাদের শিক্ষা, সাধনা, স্বাধীনতার আদর্শ ইত্যাদির চমৎকার পরিচয় পাওয়া যায়।

ভবভূতি—সংস্কৃত নাট্য-সাহিত্যে ভবভূতির স্থান কালিদাসের পরেই। তিনি অষ্টম শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার আদত নাম শ্রীকণ্ঠ নীলকণ্ঠ। বিদর্ভের এক পণ্ডিত ব্রাহ্মণের বংশে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি নিজেও সুপণ্ডিত ছিলেন। ব্যাকরণ ও ন্যায় শাস্ত্রে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। 'উত্তর-রাম চরিত', 'মহাবীর চরিত' এবং 'মালতী-মাধব'—এই তিন খানি বিখ্যাত সংস্কৃত নাটকই তাঁহার রচনা। করুণ-রসের পরিবেশনে ভবভূতি অদ্বিতীয়। প্রকৃতির সঙ্গে তাঁহার নিগূঢ় পরিচয় ছিল। তাই প্রকৃতি তাঁহার হাতে বহু স্থানে একেবারে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে।

ভর্তৃহরি—খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের কবি। বৈয়াকরণ এবং দার্শনিক হিসাবেও ভর্তৃহরি যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করেন। শোনা যায়—তিনি সাতবার ভিক্ষু-জীবন গ্রহণ করিয়া সাত বারই তাহার নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছিলেন। এ কথা সত্য হয়তো না-ও হইতে পারে। তাঁহার প্রথম জীবনের কবিতাগুলির

ভিতর যেমন ভোগ-লোলুপতার প্রচণ্ড উদ্দামতা আছে, শেষ জীবনের কবিতা-গুলিতে পাওয়া যায় আবার তেমনি বৈরাগ্যের ছাপ। রচনার এই পরস্পর-বিরোধী ভাব হইতেও এরূপ একটা কাহিনীর উদ্ভব হওয়া অসম্ভব নহে। 'বৈরাগ্য শতক' তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ। অনেকে তাঁহাকে 'ভট্টিকাব্যে'র রচয়িতা বলিয়াও মনে করেন।

মীরাবাঈ—অনুমান ১৪৯৯ খৃষ্টাব্দে মীরাবাঈ-এর জন্ম। মেবারের রাণার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। সাধারণের বিশ্বাস—এ বিবাহ সুখের হয় নাই। বিবাহের দশ বৎসরের ভিতরেই স্বামীকে হারাইয়া তিনি বিশ্ব-দেবতাকে স্বামীর পদে বরণ করিয়া ল'ন। তাহার পর রাজপুরীতে আর তাঁহার স্থান হয় না—বহু লাঞ্ছনা সহ্য করার পর তিনি রাজ-ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া পথে আসিয়া দাঁড়ান। তাঁহার জীবনের অনেকগুলি দিন বৃন্দাবনে কাটে। কথিত আছে—সম্রাট আকবর তাঁহার ভক্তি ও ভজনের খ্যাতি শুনিয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য ছদ্মবেশে তাঁহার আশ্রমে অতিথি হইয়া-ছিলেন। মীরাবাঈ-এর ভজন প্রিয়তমের সহিত মিলনের তীব্র আকাঙ্ক্ষায় ভরপূর। তাহার সুর অত্যন্ত করুণ।

রাজশেখর—জাতিতে মহারাষ্ট্র-ক্ষত্রিয় ছিলেন। খ্রীষ্টীয় দশম শতকে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষদের অনেকেরই কবি-খ্যাতি ছিল। তাঁহার নাটকগুলির ভিতর 'বিদ্ধ-শাল-ভঞ্জিকা', 'কর্পূর-মঞ্জরী', 'বাল রামায়ণ', প্রভৃতির বিশেষ খ্যাতি আছে। 'মণিদীপা'য় রাজশেখরের যে দুইটি কবিতা স্থান পাইয়াছে তাহা 'বিদ্ধ-শাল-ভঞ্জিকা' হইতে গৃহীত। 'বিদ্ধ-শাল-ভঞ্জিকা'র অর্থ কাঠের পুতুল। কলিঙ্গের অধিপতি বিদ্যাধর মল্ল চিত্র-শালায় একটি দারু-প্রতিমা দেখিয়া মুগ্ধ হ'ন। এই আখ্যানের উপরেই নাটকখানা গড়িয়া উঠিয়াছে বলিয়াই তাহার নাম দেওয়া হইয়াছে 'বিদ্ধ-শাল-ভঞ্জিকা'। রাজশেখরের রচনা অলঙ্কার-বহুল। ছন্দের উপর তাঁহার অসাধারণ হাত ছিল।

রূপমতী—মালবের শেষ বাদশা বজ বাহাদুরের পত্নী। রূপমতীর বাল্য জীবনের সহিত নানা রকমের জন-প্রবাদ জড়িত হইয়া আছে। সে সব কাহিনী বিশ্লেষণ করিলে যাহা পাওয়া যায় তাহা এই :—রূপমতী অসাধারণ সুন্দরী ছিলেন। হিন্দু পরিবারে তাঁহার জন্ম হয়। বজ বাহাদুর তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার পাণি-প্রার্থী হ'ন এবং অনেক কষ্টে তাঁহাকে লাভ করেন। ইহার পর 'হারেমে'র ভিতর রূপমতীর কাছেই তাঁহার দিন-রাত্রি কাটিতে থাকে। ফলে রাজ্য-শাসনে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। এই সুযোগে আক্‌বর বাদশা মালব আক্রমণ করেন। যুদ্ধে বজ বাহাদুরের মৃত্যু হয় এবং রূপমতী আত্মহত্যা করিয়া স্বামীর অনুসরণ করেন। কেহ কেহ আবার বলেন—রাজ্য-জয়ই আক্‌বর বাদশাহের মালব-আক্রমণের কারণ ছিল না—রাজ্যের চেয়ে তাঁহার বেশী লোভ ছিল রূপমতীর উপরে। তিনি বজ বাহাদুরের কাছে

রূপমতীকে চাহিয়াও পাঠাইয়া ছিলেন। কিন্তু উত্তরে নির্ভীক বজ বাহাদুর লিখেন—রূপমতীকে পাঠাইতে তাঁহার আপত্তি নাই, কিন্তু তাহার আগে আকবরকে পাঠাইয়া দিতে হইবে তাঁহার প্রধানা বেগমকে। ইহার পরেই উভয়ের ভিতর যুদ্ধ অপরিহার্য্য হইয়া উঠে। রূপমতীর কবিতা ছাপার হরপে বাহির হয় নাই। কিন্তু তাহা লোকের মুখে মুখে এখনও বাঁচিয়া আছে। তাঁহার গানগুলি যে জন-সাধারণের অত্যন্ত প্রিয়—ইহাদের দীর্ঘ জীবনই তাহার প্রমাণ।

শ্রীহর্ষদেব—কান্যকুব্জের রাজা। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে তিনি রাজ্য শাসন করিয়া গিয়াছেন। 'নাগানন্দ', 'রত্নাবলী', 'প্রিয়দর্শিকা' এই তিন খানি নাটক তাঁহার রচিত। 'রত্নাবলী' সম্বন্ধে পণ্ডিতদের ভিতর মতদ্বৈধ আছে। কেহ কেহ বলেন—উহা বাণভট্টের রচনা। কিন্তু রচনা-পদ্ধতির দিক দিয়া বিচার করিলে এরূপ সন্দেহ সম্পূর্ণ নিরর্থক বলিয়াই মনে হয়। কারণ এই তিন গ্রন্থের রচনা-পদ্ধতির ভিতর এত মিল আছে যে, উহা বিভিন্ন ব্যক্তির রচনা বলিয়া মনে করা কঠিন। শ্রীহর্ষদেবের যে কবিতাগুলি এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে তাহার ভিতর বসন্তোৎসব, অতনুর আক্ষেপ, সূর্য্যের আশ্বাস 'রত্নাবলী' হইতে গৃহীত, বাকি কয়েকটি লইয়াছি 'নাগানন্দ' হইতে। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন্-ট্‌সঙ্ শ্রীহর্ষদেবের রাজত্ব সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন।

শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদ—সম্ভবতঃ খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব ৫০০ হইতে ৩০০ শতকের মধ্যে রচিত। প্রথম যুগের উপনিষদগুলি অপেক্ষা এ গ্রন্থের চিন্তা-ধারা অধিকতর সংযত ও সুনিয়ন্ত্রিত। একেশ্বরবাদের অনুভূতি এ গ্রন্থেও অত্যন্ত তীব্র। শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদই ভক্তিবাদের আদিমতম উৎস। ভগবান জন্ম-মৃত্যু ও কর্ম্মের ধারা নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন, জীব-জগত নশ্বর, একমাত্র ব্রহ্মই সত্য ও চিরন্তন বস্তু—এই কথাটাই এ গ্রন্থে নিবিড় অনুভূতির সঙ্গে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে।

সুরদাস—১৪৮৪ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর কাছে শিহি গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ছিলেন মারাঠা ব্রাহ্মণ—অত্যন্ত দরিদ্র। বহু পোষ্য-পরিবৃত পিতাকে অন্ততঃ একজনের ভরণ-পোষণের হাত হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইবে মনে করিয়া অভিমানী বালক আট বৎসর বয়সেই পিতৃ-গৃহ ত্যাগ করিয়া মথুরায় আসেন এবং সেইখানেই মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত বাস করেন। সুরদাসের কবিতা ব্রজভাষায় লেখা। তাহা উপমা ও শব্দের ঐশ্বর্য্যে ভরপুর। তাঁহার প্রকাশ-ভঙ্গিও অপরূপ। কবি হিসাবে হিন্দী-সাহিত্যে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী কেহ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কেহ কেহ বলেন—তিনি জন্মান্ধ, আবার কেহ কেহ বলেন—তিনি পরিণত বয়সে অন্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার রচনায় রং-এর ছাপ এত নির্ভুল ও জীবন্ত হইয়া ধরা পড়িয়াছে যে, শেষোক্ত মতই অধিকতর সমীচীন বলিয়া মনে হয়।

হাল—'সপ্ত সতীর' সহিত হালের নাম জড়িত। এই গ্রন্থে ৭০০ শ্লোক আছে। পণ্ডিতদের কেহ কেহ বলেন—শ্লোকগুলির রচয়িতা হাল নহেন তিনি সংগ্রহ-কর্ত্তা মাত্র। কালিদাসের সম-সাময়িক অথবা তাঁহার কিছু পূর্ব্বের কবিরা যে সব শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন হাল তাহাই সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন। কতকগুলি শ্লোকে চমৎকার রসানুভূতি ও আন্তরিকতার পরিচয় আছে। হাল শাতবাহন নামেও পরিচিত।

